বুভুক্ষু

[illegible]

রাজর্ষি

দ্বাদশী

(বারোটি গল্পের সমষ্টি)

ভারতী ভবন

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

২৪।৫এ কলেজ ষ্ট্রীট - কলিকাতা

প্রকাশক ঃ

শ্রীদেবীকুমার গোস্বামী এম, এ,
৯৯, আগা সাদক্ রোড্
রমণা, ঢাকা।

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ রায়
কমলা প্রেস,

সুধা,

জীবনের পরপারে আমাদের
প্রীতির অর্ঘ্য হয়ত অর্থহীন,
তবু তোমার বিদেহী আত্মার
প্রীতিকামনায় তোমার প্রিয়
এ লেখাগুলি উৎসর্গ করিলাম।

প্রিয়কুমার

পনেরই আষাঢ়
১৩৪৪
ঢাকা

নিবেদন

এই পুস্তকের গল্পগুলি সমস্তই ইতিপূর্ব্বে কোনও কোনও মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। এক্ষণে এগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইল।

দ্বাদশটী গল্প ইহাতে আছে বলিয়া পুস্তকখানিকে "দ্বাদশী" আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। ইতি—

—প্রকাশক

সূচীপত্র

কোকিল ছানা।

নিরাশ্রয়া অন্ধ দুঃখিনী কুলিরমণী সে। আড়কাঠির প্রলোভনে পড়িয়া আসামের চা বাগানে গিয়াছিল।

আজকালকার দুর্দ্দিনে, ও দৈন্যেও অভাবের নিদারুণ নিষ্পেষণে যখন তাহারা মরিয়া হইল, তখন একদিন দলে দলে আসাম কুলিরা "মহাত্মা গান্ধী জী কী জয়" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কোনো প্ররোচনা, কোনো ভয় দেখানোর পরোয়া আর তাহারা রাখিল না,—প্রতিজ্ঞা এবার দেশে ফিরিবেই। এ মাত্র সেদিনের কথা,—সবে দীনহীনের আত্মশক্তির উদ্বোধন হইতে সুরু হইয়াছে।

আসাম হইতে দলে দলে কুলিরা আসিয়া চাঁদপুরে জুটিল। সরু সরু হাত পা পাঁজরের হাড়গুলি গণা যায়, সারা দেহের গাঁটগুলি অস্বাভাবিক রকম স্ফীত, টোলপড়া গালের উপরে চোয়ালের হাড় পাহাড়ের শৃঙ্গের মত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—সারা গায়ের মধ্যে হাড়ের ফ্রেমে আঁটা পাম্পকরা ফুটবলের মতো পেটটাই দর্শনযোগ্য হইয়া বাড়িয়াছে। তাহাতে নীল নীল শিরাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে,—সেগুলি দূরবীণেদেখা মঙ্গল-গ্রহের খাল!

"পরিধানে চীরবাস"—অত্যন্ত ময়লা, যেন কাদাজলে ডুবাইয়া রৌদ্রে শুকান হইয়াছে। তা'ও পুরুষদের কৌপীনের মতো

পরা, মেয়েদের বক্ষ হইতে আজানু কোন প্রকারে ঢাকা। মাথার চুল স্ত্রী পুরুষের উভয়েরই অতি অল্প, তৈলাভাবে রুক্ষ ও জটিল। সকলের সঙ্গেই এক একটী পুঁটুলী আছে, তাতে সম্বল—একটা ঘটি, খান কয়েক ছেঁড়া ন্যাকড়া, চার ছ' আনার পয়সা—আর একটী করিয়া তামার চাক্‌তি। ঐ তামার চাক্‌তিই নাকি তাদের বাগানের অমূল্য সম্পদ, উহা চা-কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত-করা দোকানে দেখাইলে তিনটী আনা মূল্যের খাদ্যসামগ্রী তাহাদের দেওয়ার কথা! ইহার উপর দোকানদারের "ফাউ" লাভ ত আছেই। বেচারা পাইতে পাইতে পায় গিয়া হয় তো আট পয়সার জিনিস। মাইনে বাবদ নগদ পয়সা কুলিদের হাতে দেওয়া হয় না, প্যাছে পয়সা জমাইয়া তাহাদের খর্পর হইতে উহারা পালায়। প্রায়েরই উপর মা ষষ্ঠীর যথেষ্ট কৃপা আছে বলিয়া বোধ হইল—প্রত্যেকের সঙ্গেই দুইটী তিনটী করিয়া অপোগণ্ড আছে,—প্রায়ই উলঙ্গ বা অর্দ্ধ-উলঙ্গ। সবারই চেহারা এক রকম,—হাড়ের কাঠামের উপর যেন আঠা দিয়া চামড়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এরা সব যেন মূর্ত্ত নিঃস্বতা।

হ্যাঁ সেই কুলিরমণীর কথা বলছিলাম। যখন দলে দলে কুলী আসিয়া চাঁদপুরে জড় হইল, তখন সেও আসিয়াছিল। নদীর পারে মারক্যান্‌টাইল ব্যাঙ্ক এর পাট-গুদামে হইয়াছিল তাহাদের আস্তানা। এক একটা গুদামে থাকিত সত্তর, আশী

নববই জন করিয়া! বিসূচিকা দেখিল বড় সুযোগ যায়,—সে স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিল না। যাঁহারা কাগজ পত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন কি ভাবে তখন কুলির দল নিঃশেষিত হইতেছিল। রোজ পনর-বিশ-পঁচিশটা করিয়া লোক মারা যাইত। ব্যামোটা হইত ভারি অদ্ভুত রকমের—আগে ধরিত পেটের অসুখ বা আমাশয় রোগে! দুই একদিন পরে বিসূচিকার লক্ষণ দেখা দিত।

সে দিন আস্তানায় তদন্ত করিতে গিয়া আমি অন্ধ রমণীটীকে কুড়াইয়া আনি। রোগের আক্রমণে শিথিল হস্তে সে তখন তাহার শিশুটীকে আঁকড়াইয়া ছিল। শিশুটী একটু অস্বাভাবিক, সাধারণ কুলী বালকদিগের মতন অত কালো নয়,—কালো নয় বেশ ফর্সাই। হৃষ্টপুষ্ট না হইলেও গাল দুটী নিটোল। পেটটা অপেক্ষাকৃত বড় হইলেও প্লীহা এখনও খুব বেশী বাড়ে নাই। লম্বা লম্বা চুলগুলি ঈষৎ পীতাভ চোখ দুটীর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে বালিকা টুলটুল করিয়া তাকাইতেছিল। দেহের উপর দিয়া তাহার বোধ হয় বার দুই বসন্তের হাওয়া বইয়া গিয়াছে।

"ষ্ট্রেচার"—এ মা-মেয়েকে লইয়া আসিয়া যখন রুগ্নাকে বিছানায় শোয়াইবার জন্য বালিকাকে তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইলাম, তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন মেয়েটীর দুর্ব্বল হস্তের বাঁধুনি খুলিয়া আসিতেই আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে

বলিয়া উঠিল "মেরী—মেরী লড়্কী, মেরী লড়কীকো কাঁহা লেতেহো বাবুজী" ?

আমি শিশুকে বাঁ হাতে বুকে তুলিয়া লইতে লইতে তাহার উদ্যত হাত দুখানি আস্তে আস্তে বুকের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম "কুছ্ ভয় নেহি মাই, হামরা পাস তেরী লড়কী বহুত আচ্ছা হালমে রহেগী,—বুখার মে তুম্ কেইসে আপনী লড়কীকে তদ্‌বির করোগি ?"

প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মেয়েটী বলিল "নেহি নেহি বাবুজী, লড়কীকো দেও—মেরী লড়কী" আমার সঙ্গী কালীকেশব বাবু রোগিণীকে ষ্ট্রেচার হইতে শয্যায় তুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন,—তিনি বলিলেন "মাই—কোন চিন্তা নেই তোমার। তোমার মেয়ে ভালোই থাকবে। রোজ দেখো—তোমায় দেখিয়ে নে যাবো - তুমি শীগগির ভালো হয়ে ওঠো—।"

"—নেহি—নেহি"—বলিতে বলিতে মেয়েটী অত্যন্ত অস্থির ভাবে একহাত আমার ক্রোড়স্থ শিশুর পানে বিস্তৃত করিয়া দিয়া অন্য হাতে মাটী ভর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ দুই তিন সেকেণ্ড পরে তাহার মাথাটা টুপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি কালীবাবু নীচু হইয়া রোগিণীর মাথা বামহস্তের উপর তুলিয়া ধরিলেন বটে, কিন্তু সে এই উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কালীবাবুর হাতের উপর তাহার মাথাটা গড়াইতে লাগিল,—সে

বলিতেছিল "নেহি বাবুজী মেরী লড়কী, মেরী—মেরী দুলারী, —মেরী লড়কী"—কালীবাবু তখন সন্তর্পণে রোগিণীকে বিছানায় তুলিয়া শোয়াইয়া দিলেন। আমি আর কোনো কথা না বলিয়া মেয়েটীকে বুকে লইয়া বাহির হইয়া গেলাম রেজিষ্ট্রী অফিসে,—রোগিণীর নাম ভর্ত্তি করিবার জন্য। রাস্তায় আশুবাবু, বিনয় ও রামকৃষ্ণমঠের সন্ন্যাসী স্বামী ভূমানন্দের সহিত দেখা হইল। তিনজনেই বলিলেন "বাঃ দিব্যি—ছেলেটীতো দেখছি—কোথায় পেলে?" আমি শুধু জবাবে "না, মেয়ে"—বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেলাম।

শেষ রাতের দিকটায় আবার আমার ডিউটী ছিল। ডিসেণ্ট্রা ওয়ার্ড এ ডিউটী করা এক ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রোগীদের বিছানা বদলাইতে হয়,—একটুও পা জিরাইবার জো নাই। একদফা সবগুলি বিছানা পরিষ্কৃত করিয়া একটা টুল টানিয়া একটু বসিয়াছি, চোখ দুইটা যেন আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিতেছিল;—এমন সময় সেই অন্ধ রমণীর পাশের রোগীটা ডাকিয়া উঠিল "বাবুজী—পানি।" আমি তড়বড় করিয়া বলিয়া উঠিলাম "লাতা হুঁ",—মনে হইতেছিল দুই তিন বার ডাকিয়া হয়তো বা রোগীটা সাড়া পায় নাই। মেজার গ্লাসে করিয়া তাহার মুখে একটু জল ঢালিয়া দিলাম;—দিয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় সেই অন্ধ মেয়েটী বলিল "বাবুসাব মেরী লড়কীকো কাহা "ভেজা"? আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম,

সেই সকালবেলা গোটা দুই কথা মাত্র ইহার সঙ্গে কহিয়াছি, ইহার ভিতর সে আমার গলার আওয়াজ চিনিয়া ফেলিয়াছে।

গলার স্বর তাহার উদ্বেগ কম্পিত।

রোজ রোজ পোনের বিশটা করিয়া লোক মরিতে দেখিয়া উহাদের একটা আতঙ্ক হইয়া গিয়াছিল যে হাঁসপাতালে আসিলেই রোগী বুঝি আর বাঁচে না। এই ভয়ে অনেকে রোগ গোপন করিয়া থাকিত। ব্যারাকের পরিদর্শক ডাক্তারকে কোন কথা বলিত না—ও ইহার ফলে প্রায়ই সকালবেলা ব্যারাক পরীক্ষা করিলে দুই তিনটা মৃতদেহ পাওয়া যাইত। মেয়েটীর হয়তো মনে হইতেছিল তাহাকে যখন হাসপাতালে আনা হইয়াছে, তখন সে তো বাঁচিবেই না,—মরিবার আগে বুঝি সে তাহার নয়নমণি কন্যাটীকেও দেখিতে পায় না! আমি কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সরিয়া আসিতেছিলাম,—পায়ের শব্দ অনুসরণ করিয়া সে এবার জোরে ডাকিল "বাবুজী—"

এবার আর জবাব না দিয়া পারিলাম না, বলিলাম "কেঁও মাই, তুমারী ছোকরী তো আবহি নিন্দ মে হ্যায়। ফজির হোনে দেও তব উসীকে তুবো দেখলাউঙ্গা।"

ব্যগ্রকণ্ঠে রমণী বলিল "ফজির তো হো গিয়া বাবুজী—" আমি একটু বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে কহিলাম "নেহি নেহি ফজির নেহি হুয়া, নিন্দ যাও আভি"—স্বরে বিরক্তির রেশটা বোধ হয় সে ধরিতে পারিয়াছিল, গলা নামাইয়া ভীত ধীর কণ্ঠে সে বিড় বিড়

করিয়া বলিল "নিন্দ বাবুজী, মেরী দুলারী—ইয়ে দো বরষ, মেরী দুলারী—কলিজা মেরা কলিজা"—লণ্ঠনের মিটমিটে আলো তাহার গালের একপাশে পড়িয়াছিল, দেখিলাম সূক্ষ্ম একটী অশ্রুরেখা তাহার উপর চিক্ চিক্ করিতেছে। একটু কষ্ট হইল। একবার ভাবিলাম দুইটা মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দি। কিন্তু এত রাত্রে কিছু বলিলাম না। দুঃসহ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও সমস্ত ব্যথা ছাপাইয়া কোন্ শক্তির বলে যে তাহার মেয়ের ভাবনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা রাত্রি জাগরণে শ্রান্ত আমার ভাবিবার অবসর ছিল না। তাহার পরে একদিন সে আমাকে বলিয়াছিল, যে দুলারী তাহার কী, সে যে তাহার কলিজার কলিজা। বর্ষ দুইটী বক্ষোনীড়ে জড়াইয়া ধরিয়া সে তাহার দুলারীর মাথাটী বুকের মাঝে খুঁসিয়া রাখিয়াছে, রো-জ রাতে। একান্ত নির্ভরতায় লতাইয়া পড়া দেহখানি,—সে ঘুমের ভাঙ্গনের মধ্যে মধ্যে কতবার চুম্বনে ভরিয়া দিয়াছে। চুম্বনের দৌরাত্ম্যে আধঘুমভাঙ্গা শিশু কী রকম ছোট্ট ছোট্ট আঙ্গুলগুলি দিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া ওষ্ঠাধর বিচ্যুত মাতৃস্তনটীকে মুখে পূরিয়া আবার চুক্‌চুক্ সুরু করিয়া দিতে! তার এক সাজি কুন্দফুলের মতো দেহখানি নড়িয়া চড়িয়া উঠিলে কি তাহার কোমলস্পর্শ,—অন্যে তাহা কি বুঝিবে? তাহার মাথার ঘ্রাণ মায়ের মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়া কি রকম জানি মোহতন্দ্রার সৃষ্টি করিত,—মা আবার ঘুমাইয়া পড়িত। আজ চব্বিশ মাস এমনি গিয়াছে। সে বুক

তাহার খালি! তার ছোঁয়ার অনুভূতিটুকু নাই, মৃদু নিশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যায় না, মাথার ঘুমপাড়ানি ঘ্রাণটুকু হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে না, তাহার ক্ষুধিত বাহুর আলিঙ্গনে কুন্দ-কুসুমের ডালি তুক্‌তুকে নরম দেহখানি সে আজ হাতড়াইয়া মরিতেছে, সে ঘুমায় কি করিয়া,—আর বাবুজী তাহাকে বলিয়াছেন নিন্দ্ যাইতে!

ঘণ্টা খানেক পরে মেয়েটী ভীত কুণ্ঠিত স্বরে আবার প্রশ্ন করিল "বাবুজী—ফজির—" কি করুণ তাহার স্বর! বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, রাতের আঁধার আর প্রভাতের আলোতে স্বাগত সম্ভাষণের কোলাকুলি সুরু হইয়াছে। আকাশে দু' একটা তারা তখনও উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। আমি এবার একটু কোমল কণ্ঠেই বলিলাম "হাঁ মাই, আব্‌হি উসীকো লাউঙ্গা,—এক ঘণ্টা ঔর সবুর করনা।"

"ঔ—র এক ঘণ্টা" টানিয়া টানিয়া এইটুকু বলিয়া সে তখনকার মত চুপ করিল।

সে দিন মিসেস্ স্মিথ রোগীদের দেখিতে একবার আসিয়াছিলেন। মিসেস্ স্মিথ্ ওখানকার পাদ্রী-সাহেবের পত্নী। তাঁহার কাছে কয়েকটী পিতৃমাতৃহীন কুলি বালকবালিকা রাখা হইয়াছিল। আমরা ঠিক করিলাম এই অন্ধরমণীর বালিকাকেও তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিব। তিনি সানন্দে রাজী হইলেন। পাদ্রীসাহেবের মতলব ছিল উহাদিগকে সব খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত

করিবেন। কিন্তু তাহা আমরা দেই নাই। পাদ্রীসাহেব উহাদের অবশেষে ছাড়িয়া দিতে একটু গররাজী ভাব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ডাক্তার বাবু ভারী স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তিনি পাদ্রীসাহেবকে বলিয়াছিলেন, "যদি তোমরা এদের একটাকেও খৃষ্টান কর, **we shall make Christianity impossible in India**"; ক্ষুণ্ণ হইয়া ইহার উত্তরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেন ডাক্তার বাবু, খৃষ্ট ধর্ম্মটা কি খারাপ মনে করেন আপনি?" ডাক্তার বাবু জবাব দিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম কোনটাই খারাপ নয়। কিন্তু খৃষ্টান করে' তোমরা মানুষ তৈরী কর না, কতগুলি দাস তৈরী কর। যে ধর্ম্মে জাতীয়তা বোধ ভুলিয়ে দেয় তা' আবার ধর্ম্ম? খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে তোমরা প্রভু যিশুখৃষ্টের সেবক তৈরী কর না, ইংরেজের সেবক বানিয়ে তোলো। তারা কেন যেন আর ভারতবাসী থাকে না,—হাজারে হাজারে এ প্রমাণ তোমায় আমি দিতে পারি।"

এ অপ্রিয় সত্যের জবাব কিছু ছিল না কাজেই পাদ্রীসাহেবও দেন নাই, শুধু "হ্যাঁ হ্যাঁ তা কি—সেটা কি—" ইত্যাদি বলিয়াই ক্ষান্ত পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক ইংরেজ মিশনারীরা রাজনৈতিক কার্য্যের পরোক্ষভাবে যে কত সাহায্য করিতেছে বলা যায় না।

বেলা প্রায় আটটা বাজে। মেয়েটীকে কোলে করিয়া আমি গিয়া রোগিণীর শয্যার পাশে দাঁড়াইলাম; ইচ্ছা ছিল মাকে একবার বলিয়া মেয়েকে পাঠাইয়া দিব। ডাকিলাম "ধনরাজিয়া—"

অন্ধ রমণীর নাম ধনরাজিয়া।

"—বাবুজী"

"তোমার লড়কীকে তো মেম সাহেব নিয়ে যাচ্ছে, তুমি ভালো হলে আবার নিয়ে আস্‌বেন।"

"মেম সাব্‌—নেহি বাবু মেরী লড়কীকো মেরী পাস্‌ রহনে দিজিয়ে।"

"তোমার অসুখ যে,—ব্যামোর কাছে থাক্‌লে এরও ব্যামো হবে যে।"

সে দিনই সকালে তার কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল।

আতঙ্কের স্বরে ধনরাজিয়া কহিল"উসী কো ভি বুখার হোগা—উসী কো—"

"হাঁ মাই উসীকো ভি বুখার হোগা," তার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

আশু দাদা মিষ্টি সুরে কহিলেন, "রোতী হো কেঁও মাই?—লড়কীকো ভালা করনেকে লিয়ে তো এইসা কাম করতে হেঁ—," আশু দাদা সাধু পুরুষ। এমন অদ্ভুত লোক আর দেখি নাই। মলমূত্র তিনি চন্দন জ্ঞানে দুইহাতে ঠেলিতেন। তাঁহাকে কুলীরা সবাই 'বাবা' বলিয়া ডাকিত।

অন্ধ রমণী আশু দাদার পানে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে কম্পিত কণ্ঠে কহিল "তুম্‌ ভি কহতে হো বাবা—আচ্ছা তব যানে দেও—লেকিন মেরী পাস্‌ এক দফে

উসীকো লাও বাবুজী।” ডাক্তার বাবু চোখ ঠারিয়া ঈসারায় রোগীর কাছে শিশুকে লইতে মানা করিলেন। পরে কহিলেন “মাই বুখার ওয়ালী জনানা কা পাস্ লড়কীকো নেই লেনা চাহিয়ে।”

আমি রোগিণীর বিছানার পাশ কাটাইয়া মেম সাহেবের কোলে শিশুকে দিতে অগ্রসর হইতেছিলাম, হঠাৎ ধনরাজিয়া কাৎ হইয়া খপ করিয়া আমার পাঞ্জাবীর নীচের পকেটটা ধরিয়া ফেলিল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া ঠিক মত বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। আর্ত্তকণ্ঠে রমণী একবার চেঁচাইয়া উঠিল “দুলারী ও—বা—বু—জী—” তারপর আপাদ মস্তক কম্বলটা টানিয়া দিল। মেম সাহেবের কোলে যাইতেই শিশু হাত পা ছুড়িয়া বিষম কান্না জুড়িয়া দিল। মেম সাহেব রোরুদ্যমান শিশুকে সামলাইতে সামলাইতে প্রস্থান করিলেন। কাপড় ঢাকা মেয়েটীর পানে চাহিয়া দেখিলাম। ফুলিয়া ফুলিয়া তাহার সে কি কান্না!

* * * *

পরে একদিন কনভেণ্ট-এ গিয়াছিলাম। শুনিলাম দিন পোনেরো ষোলো দুলারী নাকি মার জন্য অনেক কান্নাকাটি করিয়াছিল। তারপর সেখানকার লোকদের, বিশেষতঃ মিসেস স্মিথ্ এর চেষ্টায় বনের পাখী বেশ পোষ মানিয়াছে, দিব্য এখন সে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া বেড়ায়। এখন কান্নাকাটি গিয়াছে।

সে হাসেও খেলেও,—তার দুষ্টামীতে সবাই অস্থির। তার নতুন নাম হইয়াছে 'লিলি'।

* * * *

পাঁচ সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। রমণী প্রায় সারিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপরে রোগ জনিত পাণ্ডুর আভা এখনও মিলায় নাই। তথাপি দ্বাবিংশ বৎসরের পরিপুষ্ট যৌবনশ্রী তাহার দেহখানির উপরে যে সহজ লাবণ্যের ছোপটুকু ধরাইয়া দিয়াছে তাহা এত অত্যাচারেও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই।

আজ খুকীকে লইয়া আসিবার দিন। আমি দাওয়ার টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া রোগীদের জন্য মল্টেডমিল্ক তৈরী করিতেছিলাম। এই মাত্র সে আমার কাছে বসিয়া তাহার প্রিয়তমা লড়কীর ইতিহাস শেষ করিয়াছিল। বাগানের মেয়েদের মধ্যে সেই নাকি খুবসুরৎ ছিল,—তাইতে সে ছোট সাহেবের নেকনজরে পড়ে। সাহেব তাহার চোখদুটীর নাকি খুব তারিফ করিতেন। সেই চোখ দুটীই যখন তাহার টাইফয়েড জ্বরে সে জন্মের মত হারাইল, তখন সাহেব ছিন্ন মালার মতো তাহাকে পথের পার্শ্বে ছুড়িয়া ফেলেন। তখন দুলারী পেটে। ফের সে চায়ের পাতা তুলিতে লাগিয়া যায়। কিন্তু তাহার বরাদ্দ হইল দৈনিক তিন আনার জায়গায় ছয় আনা। কিন্তু সেটা ছোট সাহেবের অন্ধ রমণীর প্রতি করুণার পরিচয়, কিম্বা প্রণয়ের প্রতিদান তাহা ঠিক বলা যায় না। তারপর দুলারী হইল।

সেই একমাত্র তাহার খালি বুকটাকে ভরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহার নাম সে সাধ করিয়া রাখিয়াছিল দুলারী। কি করিয়া সে যে তাহাকে মানুষ করিয়াছে! রোজ ছ' আনা সংগ্রহের মধ্যে দুলারীকে খাওয়াইয়াছে তিন আনা, তার বিবাহের জন্য জমা করিয়াছে দুই আনা, আর তাহার নিজের জন্য ব্যয় হইয়াছে চার পয়সা। এই গেল তাহার দুই বৎসরের ইতিহাস। এই নির্ল্লজ্জ নির্ম্মমতার কাহিনী সে বেশ নিঃসঙ্কোচে বলিয়া গেল। বোধ হইল—যেন এ অতি সাধারণ কথা, নিত্যকার ব্যাপার। আমি ভাবিতেছিলাম,—কিন্তু সন্তানের জন্য এই যে অগাধ স্নেহ —ইহা এই বন্য অসভ্য স্ত্রীলোকটা কোথায় পাইল?

তখন সূর্য্য ডোবে ডোবে। কাহিনী শেষ করিয়া মিনিট দুই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই তাহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। অষুধপত্র রাখিবার টেবিলটার হাত চারেক দূরে একটা মাদুরের উপর সে বসিয়াছিল আর গায়ের কম্বলখানার প্রান্তভাগটী মাঝে মাঝে অকারণে নির্দ্দয় ভাবে মোচড়াইতেছিল। মাঝে মাঝে মাদুরটাকে দুইহাতে ঝাড়িতেছিল,—কখন শুইতেছিল আবার একটু পরেই উঠিয়া বসিতেছিল। তাহার কাহিনী শেষ হইবার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে সে আমাকে অন্তত সাত আটবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে মেম সাহেব আসিবে কি না,—কখন আর আসিবে, সন্ধ্যা যে হইতে চলিল, তাঁহার অসুখ হইয়াছে নাকি,—

দুলারী ভালো আছে তো, মেম সাহেবের কুঠি খুব দূরে নাকি—আরো সব কত কি! আমি রোগীদের ফরমায়েস যোগাইতে যোগাইতে দুই একটা হাঁ না বলিয়া তাহার জবাব সারিতেছিলাম। ক্রমে সে বড়ই উতলা হইয়া পড়িল। মাঝে মাঝে তাহার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিতে ছিল—এবং ক্ষণে ক্ষণে আমার আশ্বাস পাইয়া নিজের অহেতুকী আশঙ্কাতেই একটু একটু হাসিতেছিল বোধ হয়। আশুদাদা ইতোমধ্যে একবার উহাকে বলিয়া গেলেন ঘরে যাইতে, যে সন্ধ্যা হইয়াছে, হিম লাগিবে। নরেনও বার দুই বলিল, কিন্তু কোনো কথাই তাহার কাণে যাইতেছিল না।

গোটা সাতেকের সময় দুলারী ওরফে লিলিকে কোলে করিয়া মিসেস স্মিথ দেখা দিলেন। আমি চেঁচাইয়া বলিলাম ধনরাজিয়া তুহারী লড়কী আ গয়ীরে। আমারও ভারী আনন্দ হইতেছিল। আমার হাতের রোগী এতদিনে সারিয়া উঠিয়া মা মেয়ে আবার দেশে যাইবার স্বপ্ন দেখিতে থাকিবে! চাহিয়া দেখিলাম,—আমার কথা শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে তাহার বুক দ্রুত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, যেন তাহার শ্বাসরোধ হইতে চলিয়াছে। আজ ছত্রিশ দিন সে তাহার খুকীকে বুকে করে নাই; এতকাল পর মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া সে কি তাহাকে সত্যই পাইবে?

রুদ্ধকণ্ঠে সে চেঁচাইয়া উঠিল "দুলারী"—কী সে ডাক, যেন মমতার উৎস ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

দুলারী তখনও মেমসাহেবের কোলে। পরণে তার ধবধবে সাদা একটা ফ্রক, পায়ে কাঁটার বোনা উলের মোজার উপরে বোতাম লাগানো ভেলভেটের জুতা, মাথায় লালরংয়ের একটা টুপী। মেমসাহেব তাহাকে কোল হইতে নামাইতে নামাইতে কহিলেন "যাও লিলি, তুম্‌হার মাইকা পাশ যাও।" লিলি তখন মিসেস স্মিথ এর বুকে সরু চেইনে ঝুলান সোনার ক্রুশটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল।

ব্যগ্র বাহু মেলিয়া ধনরাজিয়া ডাকিল "মেরী মাই,—মেরী দুলারী—"

কিন্তু খুকী তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া মেম সাহেবকে দুই হাতে জড়াইয়া এপ্‌রণের মধ্যে মুখ লুকাইল। মূহূর্ত্তের পরে একবার আড়চোখে মলিনবসনা রমণীর পানে চাহিয়া শিশু নিজের মাকে বলিল "তুমি দাই বহ মেরী মাই নেহি।"

বিধির বিচার।

শরতের উজ্জ্বল প্রভাত! শিশির-ধোয়া ঘাস-পাতার উপরে প্রভাতের সোনালী আলো চিক্‌মিকি তুলিয়াছে।,—যেন অভিমান অশ্রুসিক্তা কিশোরীর গণ্ডে প্রিয়তমের সোহাগস্পর্শে আঁখির

জল না শুকাইতে শুকাইতেই ওষ্ঠে তাহার সলজ্জ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ছোট্ট উঠানটির কোণে আনাচ-কানাচের জঞ্জাল ঝাঁট দিয়া জড় করিয়া, উবু হইয়া কাজ্‌লী একটা ভাঙ্গা সাজিতে তাহা তুলিতেছিল,—এমন সময় মুন্না মাথায় পট্‌কা জড়াইতে জড়াইতে পশ্চিম-দুয়ারী ঘরখানি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার পিঠে ছোট্ট একটা কিল মারিয়া কহিল, "ঘুমিয়ে থাকতে আমায় না ক'য়েই ভোর বেলা বেরিয়ে এসেছিস্‌ যে বড়!"

সাজিটা মাটিতে রাখিয়া, সোজা হইয়া, মৃদু হাসিয়া কাজ্‌লী জবাব দিল, "কাল খাদ থেকে ফিরে অবধি তোমার মাথা ধরেছিল, ভাবলুম—ভোরবেলা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুলে তাতে উপকার হবে। তা যাচ্ছ তো ফের খাদে—আজ না গেলেই হয়তো ভালো করতে।"

বাহাদুরীর সুরে মুন্না স্ত্রীর সুপুষ্ট কালো কুচকুচে গালের উপর একটা টোকা মারিয়া কহিল, "মাথা এখনো আমার ধরেই আছে আর কি—এত অল্পতেই এলিয়ে পড়লে দেহটা রেখেছি কেন?" চার হাত উচু, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা দৈত্যের মতো তাহার দেহখানি একটা দেখিবার জিনিষ ছিল বটে।

একটু থামিয়া, একটু মুচকি হাসিয়া সে আবার কহিল,—"আর তোর কথা মত ব'সে ব'সে থাক্‌লে তোর রূপোর বালা পাঁচ বছরেও হবে না, তা বলে দিচ্ছি।"

রাগিয়া কাজ্‌লী জবাব দিল, "যাঃ-ও,—কথায় কথায় তোমার ঐ এক কথা ; তোমার ভালোমন্দ বেশী কি রূপোর বালা বেশী, —না, আমি তোমার কাছে তা চেয়েছি কখনো ?"

ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুন্না জবাব দিল, "বলি চটিস্ কেন,— চাস্ নি বটে, কিন্তু রাজিয়ার হাতের বালা জোড়াটা তোর পছন্দ হয়েছে আমায় বলিস্ নি ?"

"তা যদি আমি বলি ঝরিয়ার রাণীমার গলার জহড়তের হার আমার পছন্দ হয়েছে,—তো তাই আমাকে দেবার জন্যে তোমার সখ হতে হবে,—না, সে কথার মানে করতে হবে আমি অম্‌নি একটা হার চাই ?"

হাসিয়া ফেলিয়া মুন্না বলিল, "অহঙ্কার একবার দেখ না,— তোকে সাজাবার সখেই গয়না দিতে যাচ্ছি—না ? সেই কারণটাই আগে বাৎলালেন ! ছ্যাখ অত অহঙ্কার ভালো নয়।"

—"বেশ"—

"আচ্ছা রাগিস্ কেন,—না হয় আমারি সখ। কিন্তু এ সাধ হওয়াটা কি অন্যায় ? তুই লছমন্‌কে বিয়ে করলে সে তোকে সোনায় মুড়ে দিত, আর আমি তোর যা দু' একখানা গয়না ছিল তা-ও বাবার ব্যামোর সময় বেচেছি। তুই না চাইলেও যতটুকু শক্তি আছে গতর খাটিয়ে কি আমার উচিত নয়—"

বাধা দিয়া কাজ্‌লী সক্রোধ ভ্রূভঙ্গে বলিয়া উঠিল, "বলেছি না একশ'বার এ-সব বাজে বোকো না ;—আমি কিছুতেই

তোমার ছাইয়ের বালা পরব না। কাজে যেতে হয় এখন কাজে যাও। আমার হাতের বালা গড়াও তো মাথার দিব্যি রইল।"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে মুন্না কহিল, "সত্যি বালা নিবি নে?"

কাজ্‌লী গোঁজ হইয়া রহিল—জবাব দিল না।

দুষ্টামি ভরা হাসিমুখে মুন্না আবার কহিল, "আচ্ছা না নিস্ তুই না নিবি, আমার খরচ বেঁচে যাবে। কিন্তু খুব ছোট্ট দুখানি বালা আমি চৈতমাসে গড়াবোই,—দেখি তা কাজে লাগে কি না।"

লজ্জারক্তিম মুখে কাজলী বলিল, "যাঃ-ও"—উবু হইয়া জঞ্জালগুলি ভাঙ্গা সাজিতে তুলিতে ব্যস্ত হইল।

কাজ্‌লী চারমাস অন্তঃসত্ত্বা।

মুন্না তাহার মুখখানা জোর করিয়া তুলিয়া ধরিতে যাইতেছিল,—এমন সময় খক্ খক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে মুন্নার বাপ পূব-দুয়ারী ঘর হইতে হুঁকা হাতে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। চট্ করিয়া মুন্না নিতান্ত সপ্রতিভের মতো পাগড়ীর কোণটা কাণের পাশে গুঁজিতে গুঁজিতে চেঁচাইয়া বলিয়া গেল, "একটার সময় আজ আর খাদে খাবার নিয়ে যেতে হবে না, রত্‌না আজ আমায় নেমন্তন ক'রে রেখেচে ওর সঙ্গে খেতে।"

বিধির বিচার।

সরকার সাহেব—এফ, সি, সরকার—লক্ষপতি। পাঁচ-পাঁচটা কয়লার খনির তিনি স্বত্বাধিকারী। ধানবাদ জেলার ভেড়াহাটে তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী। দাস-দাসী, আমলা-কর্ম্মচারী, গাড়ী-ঘোড়া প্রভৃতিতে বাড়ীখানা গম্ গম্ করিতেছে। বাড়ীর মস্ত কম্পাউণ্ড ;—বড় দালান হইতে দেউরী পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ বিঘা জমি দেশী-বিলাতী ফুলের বাগানে সজ্জিত। দেউড়ীর বাইরে বাঁ দিকে মুখোমুখী তুখানি ঘরে বাবুদের মালীর আস্তানা। দেয়াল তার ইটের,—ওপরে টিন দিয়া ছাওয়া। তুইখানি ঘরের মাঝে অপ্রশস্ত উঠান কাজ্‌লীর নিপুণ হস্তের পরিচর্য্যায় ঝক্ ঝক্ করে। মাতৃহীন মুন্নার বুড়া বাপ হইল বাড়ীর মালী।

সে অনেক দিনের কথা—যখন ফকির সরকার ষাট্ টাকা মাইনায় সার্ভেয়র হইয়া এ অঞ্চলে আসেন। তারপর কপাল জোরে ধূলা ছুঁইতে কড়ি হইতে হইতে কেমন করিয়া ফকিরচন্দ্র আমীর হইয়া উঠিল সে ইতিহাসে আমাদের প্রয়োজন নাই। শুধু ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইবে ফকিরচন্দ্র এখন এফ-সি, সরকার, লক্ষপতি, চামড়ার রং ছাড়া সাড়ে ষোলো আনা সব সাহেব, এবং ততোধিক সাহেব-সঙ্গ-প্রিয়। মাসে মাসে তু'চার বার বাড়ীতে তাহার শ্বেতাঙ্গ স্ত্রীপুরুষসঙ্কুল পার্টি না হওয়াটাই বিচিত্র। এহেন একটা পার্টিতে কি বন্দোবস্ত হইবে না হইবে তাহা লইয়া সেদিন দ্বিপ্রহরে স্ত্রী-পুরুষে আলোচনা হইতেছিল। মিসেস্ সরকার এয়োদশ বর্ষে আলতারাঙা পায়ে চুট্‌কী বাজাইয়া,

নোলোক-নাকে, রাঙাচেলীর ঘোমটা-ঢাকা হইয়া ফকির সরকারের সহধর্ম্মিণীরূপে সংসারে আসিয়াছিলেন; আজ ত্রিচত্বারিংশ বৎসর বয়সে মেমসাহেব শিক্ষয়িত্রীর দৌলতে "হাইহিল্" জুতামণ্ডিত পায়ে, তর্জ্জনী ও মাধ্যমার সাহায্যে পার্শীসাড়ী সাম্‌লাইয়া কাদাখোঁচার মতো পা ফেলিতে ফেলিতে তিনি ড্রইংরুমে ভদ্রাভদ্র অভ্যাগতদিগের পরিচর্য্যায় সুনিপুণা। লক্ষ্মী-সরস্বতীর সতীন সম্বন্ধ হইলেও এক জায়গায় তাহাদের একটা প্রকাণ্ড মিল আছে। বিদ্যা জিনিষটা নাকি যতই পাওয়া যায়, বোঝা যায় না বিদ্যার গভীরতার কতখানি পরিবর্ত্তন হইল। অর্থ জিনিষটাও অম্‌নি যতই পাওয়া যায়, জানাই যায় না থলিটা কতদূর ভারী হইয়া উঠিল এবং তদ্ধেতু প্রকৃতির কেমন করিয়া কতটুকু অদল-বদল হইল। ফকির আমীর হইয়া কদাচিৎ ভাবিতে পারে তাহার কোনদিন আমীরী তবিয়ত ছাড়া অন্য কিছু ছিল। সরকার-দম্পতীতে এ সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বিজ্‌লী পাখার নীচে দাঁতে চুরুট কাটিয়া মিষ্টার সরকার কুশান্-শায়িতা পত্নীর পানে চাহিয়া বলিতোছিলেন, "ওগো শুন্‌ছ, খাদের কুলিরা নাকি জোট করেছে দিন-মজুরী এক আনা করে বাড়িয়ে না দিলে তারা ধর্ম্মঘট করবে। ব্যাটাদের পয়সা পেয়ে আর আশ মেটে না,—আমিও বাবা সেয়ানা কম নই,— করুক দেখি ধর্ম্মঘট। Mine Owners' Association যা

তৈরী ক'রে তুলেছি,—তাতে এ ব্যাটারা ধর্ম্মঘট করলে অন্য খাদ থেকে মজুর ধার ক'রে এনে ডবল মজুরী দিয়েও যতদিন ব্যাটারা সায়েস্তা না হয় কাজ চালাবো। **Association** এর **members** দের আজ বিকেলে পার্টিতে ডেকেছি,—এদের হাত করতে হবে। তুমি **ready** থেকো।"

বাঁ কনুইএর উপর ভর দিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া মিসেস্ সরকার কহিলেন, "তুমি অবাক কল্লে,—সেদিন না দু'পয়সা ক'রে **increment** দিলে,—ফের দিন-মজুরী বাড়ান চাই!—কোনদিন না যেন খনিশুদ্ধই দাবী ক'রে বসে!—যাক্—তা পার্টিতে কে কে আস্‌বেন?"

"**Hopkins Jesse, Mr. and Mrs Shirby,** আগরওয়াল, ভাটনগর, ব্যাণ্ডো, বোস—আর দু'একজন।"

"ওঃ মিষ্টার বোস্‌ও আস্‌ছেন!—নেলি, নেলি,—বয়,—নেলিবাবাকো হিঁয়া জল্‌দি ভেজো।"

"আর ছাখো কোনো জিনিষপত্তর না থাক্‌লে রহ্‌মানকে দিয়ে তা আনিয়ে রেখো। সে যেন কাল বল্‌ছিল হুইস্কি একেবারেই নেই।"

মিষ্টার সরকার নিজে হুইস্কির সদ্ব্যবহার বড় করেন না বটে কিন্তু বন্ধুদের সম্পর্কে এ সম্বন্ধে তিনি মুক্তহস্ত।

"**Guest** এই ক' জনাই তো, না আরো কেউ আস্‌ছেন?

ইতোমধ্যে স্কার্ট-পরা অষ্টাদশবর্ষীয়া মিস্ নেলি সরকার কক্ষান্তর হইতে হাজির হইলেন। মা কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি আজ বিকেলে drive-এ বেরুবে বলেছিলে, তা বেরিওনা যেন,—বিকেলে পার্টি আছে,—মিষ্টার ব্যাণ্ডো, বোস ওঁরা সব আসবেন।"

একান্ত বাধ্য ছাত্রীর মতো মিস্ নেলি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "আচ্ছা মা—"

"আর দেখো, স্কার্ট্ ছেড়ে তোমার ধানী রংএর শাড়ীখানা আর আনারসী রংএর ব্লাউসটা পোরো। লাভচাঁদের দোকান থেকে সেদিন যে নেক্‌লেসটা এলো সেটাও জুয়েল কেস্ থেকে নিয়ে নিয়ো,—বুঝলে ?—আচ্ছা যাও।"

এসেন্সের গন্ধে ঘর সুরভিত করিয়া, রুজমাখা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টানিয়া মিস্ নেলি বাহির হইয়া গেলেন। মাতা ও কন্যা উভয়েই জানিতেন মিষ্টার বোস একটা বড় শিকার। (ইহার উলঙ্গ কদর্য্যতা লইয়া স্পষ্টতঃ মায়ে-ঝিয়ে আলাপ না হইলেও কৃত্রিম শ্লীলতার আবরণে তাহার কদর্য্যতা কতদূর ঢাকা পড়িত তাহা বলা শক্ত।)

"হ্যাঁ ভালো কথা—আর তো guest নেই ?"

"না,—হ্যাঁ,—আছেন, আছেন বৈকি,—মিস্ গ্রেও আসবেন।"

মিস্ গ্রে ওখানকার একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেডী ডাক্তার। লোকের মুখের কথায় ট্যাক্স নাই, তাই বোধ হয় লোকে মিস্ গ্রে ও সরকার সম্বন্ধে অনেক কিছু কথা কহিত। মিসেস্ সরকারের কাণে সে-কথা যাইতে বাকী ছিল না; তিনি কপাল কুঞ্চিত করিয়া ভ্রূ বাঁকাইয়া কহিলেন,—"**Association**-এর **meeting**-এ ওর আসবার মানে?"

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া মিষ্টার সরকার একটু থতমত ভাবে কহিলেন, "মানে—কেন—"

উষ্মার সঙ্গে মিসেস্ সরকার বাধা দিয়া কহিলেন—"যাক সে কথা—আমার গৃহে ওরকম **reputation**-এর লোকের **presence** আমি বরদাস্ত করতে পারব না।"

এই কথাগুলির মধ্যে যে কদর্য্য ইঙ্গিতটুকু ফুটিয়া উঠিল—সেটা মিষ্টার সরকার বুঝিলেন। প্রচণ্ড একটা ক্রোধের জ্বালা তাঁর চোখে ঘন হইয়া ফুটিয়া উঠিলেও মুখে কিন্তু কিছুই ফুটিল না—কেবল তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন—"সে দেখা যাবে।"

স্বামীকে স্ত্রী চিনিতেন। অতএব নিরুত্তরে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া মিসেস্ সরকার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

বৈকাল বেলা অভ্যাগতরা যখন দর্শন দিতে লাগিলেন, মিসেস সরকার তখন বদান্যতা ও শীলতার প্রতিমূর্ত্তি রূপে সবাকার তুষ্টি সাধন করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই।......

অথচ ইহাদের দাম্পত্যজীবনের এ অধ্যায়ের পূর্ব্বের কয়েক

পৃষ্ঠা উল্টাইলে এমন দিনও ছিল দেখা যাইবে যখন পত্নীর মুখে চাহিয়া দরিদ্র ফকিরচন্দ্রের সদ্যফোটা পদ্মকোরকের কথা মনে পড়িত,—চাহিয়া চাহিয়া আশ মিটিত না। কত নিশুতি রাতে ষাট টাকা তন্‌খার সার্ভেয়র উইধরা কেরোসিন কাঠের ভাঙ্গা জান্‌লার গরাদের ভিতর দিয়া চাঁদের পানে চাহিতে চাহিতে ভাবিয়াছেন তাঁহার বাহুবদ্ধা ষোড়শী পত্নীর মুখখানি ঐ কলঙ্কী চাঁদের চাইতে অকলঙ্ক কি না! ঘরের বাইরে পূব কোণায় একটা হাস্‌নাহেনার গাছ ছিল—প্রত্যূষে তাহার গন্ধ যখন মৃদু হইয়া আসিত, ফকিরচন্দ্র ঘুম ভাঙ্গিয়া অনুভব করিতেন স্ত্রীর অযত্নবর্দ্ধিত রুক্ষ কেশপাশের মৃদুগন্ধ হেনার গন্ধের চাইতে মিষ্টি। থম্‌থমে কালো মেঘভারের মতো সে চুলের রাশ যখন তিনি আঙ্গুলদিয়া চিরিতে থাকিতেন, তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া বালিকা বধূ তাহার হাত দুখানিতে কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিত। সেই শুভ্র নরম হাত দুখানির পানে চাহিতে চাহিতে বায়োস্কোপের ছবির মতো তাঁহার মনে জাগিত, ঐ হাত দুখানি কত কাজ করে,—উহারই মঙ্গলস্পর্শে তো তাহার অনটনের সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে প্রোজ্জ্বল হইয়া আছে। ঐ হাতে সে অন্নপূর্ণার মতো অন্ন বিতরণ করে,—সুকুমারের জামা কাপড় পরাইয়া দেয়, রোগা নীলিমাকে বুকে করিয়া পিতলের ঝিনুক দিয়া দুধ খাওয়ায়। সুকুমার এখন এস্, সরকার B. Sc. হইয়া বিলাত গিয়াছে, নীলিমা হইয়াছে 'নেলি'। সেদিন আর নাই। গাড়ীঘোড়া হইয়াছে, মোটরকার

হইয়াছে, বড় বাড়ী হইয়াছে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর দুইটি যুগ্ম আঁখি আর পরস্পরের পানে সে চাহনি চায় না, আঙ্গুলের একটি ডগা স্পর্শ করিবার লোভে কারুর বুকের রক্ত তালে-বেতালে নাচিয়া উঠে না ; সেই দুখানি হাত তেমনি শুভ্র নরম আছে, কিন্তু পায়ে, গায়ে, কপালে হাত বুলাইবার সময়ে আনন্দশিহরণে তাহা আর থর থর করিয়া কাঁপিয়া সারা হয় না ; এখন দশজন ভৃত্যে সে সব কাজ করে। মিষ্টার সরকার সে সেবা হয় তো এখন চান-ও না ; তাঁর স্ত্রীর দেহ-মনও আর স্বামীর জামা কাপড় গুছাইবার জন্য, মাথা আঁচড়াইয়া দিবার জন্য, শ্রান্তি অপনোদনে তালপাতার পাখায় হাওয়া করিবার জন্য, ব্যগ্র হইয়া সন্ধান খুঁজিয়া ফেরে না। সংসারযন্ত্র চলিতেছে বটে, অথচ ইহার কলকাঠির কোথায় যেন কি বিগড়াইয়াছে। ধনে, জনে, অভিজ্ঞতায়, শিক্ষায়, তাহাদের ঐশ্বর্য্যসম্ভার তো উপ্ছিয়া পড়িতেছে—কিন্তু তবু……।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সরকার-ভবনের সুপ্রশস্ত ড্রইং রুমে বিজলী ঝাড়ের তীব্র আলোকে কক্ষের বহুমূল্য আস্‌বাবপত্র চকমক্ করিতেছে। অভ্যাগতগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরের মুখোমুখী দেয়ালে মস্ত বড় দু'খানা আর্সী নিমন্ত্রিতদের অফুরন্ত প্রতিচ্ছবির সার প্রতিফলিত করিতেছিল। আর এক দেয়ালে **mine districts** এর প্রকাণ্ড একখানি মানচিত্র ঝুলিতেছিল, **Jesse** সাহেব—**'an excellent map'**

বলিয়া তাহার প্রশংসা করিলেন, হ্যারল্ড-এর বাড়ীর মস্ত পিয়ানোর চাবিগুলার উপরে লঘু হস্তে আঙ্গুল বুলাইয়া লইয়া **Mrs. Shirby** সমঝ্‌দারের মতো সেটাকে তারিফ করিয়া বলিলেন **"a splendid instrument." Hopkins** টেবিল চাপড়াইয়া পরামর্শ দিল ধর্ম্মঘট হইলে ভয় করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সে দু' হাজার কুলি তার গিরিডির আভ্‌্রের খনি হইতে আনিয়া মিষ্টার সরকারকে সাহায্য করিবে। আর এমনই যদি হয়—**'if worst come to the worst'**, না হয় **'dead lock'** হইবে,—তাঁহারা সকলে মিলিয়া দেখিয়া লইবেন এই **'ricketty beggars'** গুলা কত দিন **'hold out'** করিতে পারে। ব্যাণ্ডো (বন্দ্যোপাধ্যায়) কহিয়া উঠিলেন,—"আলবৎ,—গেছে বছর আমার রামহাটের **colliery** টাতে দু' পয়সা ক'রে **increment** দিয়ে মাত্র পঞ্চান্ন হাজার টাকা **income** হয়েছে,—অথচ তার আগের বছর **eighty thousand and odds** লাভ হয়েছিল। ব্যাটাদের খাঁই আর মেটে না। সাড়ে ছ' আনা দিন-মজুরীতেও নাকি শালাদের পোষায় না,—বেটারা সব নবাবের ছা' হয়ে পড়েছেন।"

পরামর্শাদি শেষ হইলে মিস্ নেলি সরকারের ইংরেজী বাংলা গান হইল,—মিষ্টার বোস্‌এর তারিফ যে তদুপলক্ষে সব চাইতে জোর গলায় হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ডিনারের পর মিসেস্ সরকার এত সুশিক্ষিতা ও মার্জ্জিত-রুচি হইয়াও

সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। সুরার মাত্রাধিক্যে Shirby যখন তান ধরিলেন,—

"I can hear the public murmuring
I know the sort of ballad they 'ill sing
The vulgar herd—but 'tis my affair—
Laire lan laire,"—

তখন মিস নেলিকে লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। মিঃ বোস দাঁতে দাঁত চাপিয়া যেন অসহ্য বিরক্তিতে বলিয়া উঠিলেন, **"beastly,—disgusting,"**—এবং মিসেস সরকারের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

এমন সময় দেউড়ীর দরজায় কিসের একটা গোল শোনা গেল,—এবং কিয়ৎক্ষণ পরে নারী-কণ্ঠের বুকফাটা আর্ত্তনাদে সে স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল। Hopkins বিরক্তিপূর্ণ মুখে শ্যাম্পেনের গ্ল্যাস মুখ হইতে নামাইয়া বলিয়া উঠিল,—**"What the hell do they mean by the hubbub !"**

ঘরের এক কোণায় মিঃ সরকার মরিয়া হইয়া মিস্ গ্রে'র সহিত **flirt** করিতেছিলেন,—তিনি রসভঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া ডাকিলেন, "বেয়ারা—"

বেয়ারা ছুটিয়া আসিলে বলিলেন, "সোর কেঁও হো রহা হ্যায় ?"

বেয়ারা ছুটিয়া গিয়া দুই মিনিট পরে খবর লইয়া আসিয়া বলিল, "মুনা খাদ্‌মে আজ সাম কো মর গেয়া, উস্‌কো আউরৎ

রো রহী হ্যায়। শিরপর উস্‌কো কোয়লা কো ডেলা গির গেয়া থা।"

অভাগিনীর বুক্‌ফাটা রোদন-ধ্বনি সায়াহ্ন আকাশে তখনও ডুকরিয়া মরিতেছিল—"আমার কি হবে গো,—তোমার কাজলীকে ছেড়ে কোথায় গেলে গো!"

সরকার মিস্ গ্রেকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতেই, ব্যাঙো তাহা শুনিয়া ভাঙ্গা গলায় চেঁচাইয়া উঠিল,—**Oh! Oh! the dark girl over there is a beauty;—an Egyptian beauty,**—খাসা চীজ্"—ও পরে বাজখাঁই আওয়াজে তান ধরিল, "আঁখি যে দিয়াছে বিধি দেখ্‌ব বলে নিরবধি—"

সরকার বেয়ারার পানে চাহিয়া কহিলেন,—"মর্ গয়া তো মর্ গয়া,—উস্‌কো এৎনী জোরসে মৎ চিল্লানে বোলো—যাও, খামুশ হোনে বোলো।"

মিনিট দুই পরে দেউড়ীর গালপাট্টাদাড়ীওয়ালা দারোয়ানের সিংহগর্জ্জন শোনা গেল ও যুগপৎ স্বামিহারা রমণীর সশব্দ আর্ত্তনাদ অন্তর্মুখীন হইয়া বুকের পরতে পরতে ঘুরিতে লাগিল। কাজলী উহা সহিবে কিরূপে? ওগো একি বিশ্বাস করা যায়? আজ ভোরেও না প্রিয়তম তাহার যৌবনস্বাস্থ্যে লীলায়মান ছয় ফুট সবল ঋজুদেহ লইয়া তাহাকে কত-না মধুর আশার বাণী শুনাইয়া কাজে গিয়াছিল! এই স্বাস্থ্য, এই শক্তি, এত ভালোবাসার সুগভীর সাগর কি এক লহমায় শুকাইয়া গেল?

কি পাপ সে করিয়াছে যে, প্রিয়ের বক্ষের উপরে পড়িয়া সে জন্মের শোধ একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেও পারিবে না?

অভাগিনী জানে না যে, ধনী মনিবের নর্ম্ম-উৎসবে উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া প্রিয়বিয়োগবিধুরা দুঃখিনী রমণীর কান্নাও ব্রহ্মহত্যার চেয়ে কিছুমাত্র কম অমার্জ্জনীয় অপরাধ নয়!......

মিষ্টার সরকারের ড্রইং রুমে তখন Mrs. Shirby সরু কর্কশ গলায় স্বামীর গানের চরণে কোরাস্ ধরিয়াছেন,—

"In spite of jealousy and rebuke
I'd see my husband made a duke,
I'm sick of the sight of his desk & chair,
Laire lan laire."

গোটা তিন চার হুইস্কি শ্যাম্পেনের বোতল ভাঙ্গিয়া মেঝেয় গড়াগড়ি যাইতেছিল। মার্ব্বেল পাথরের উপরে রক্তবর্ণ ধারা বহিতেছিল,—তাহা সুরা, না মুন্নার মতো হতভাগাদের রক্ত?

ভুল।

সহরের শেষ সীমানায় ঘাসে ছাওয়া মাঠের পারে ছোট্ট, লাল বাড়ীখানি। যেন কালো মেয়ের কপালে সিঁদূরের টিপ।

সেখানে থাকে মা আর মেয়ে।

মেয়ের নাম কমলা। মা আদর করে ডাকেন—কমলা কম্‌লি, কমল,—কখনো বা হিন্দুস্থানী কায়দয়ে কম্‌লা।

বাপ বেঁচে থাকতে তিনি ছিলেন সাহেবী মেজাজের। মা তাঁর কাছে পেয়েছিলেন স্বাবলম্বনের চমৎকার শিক্ষা—তাইতে আত্মীয় স্বজনের দ্বারস্থ না হয়ে একা মেয়ে নিয়ে থাকেন। স্বামীর কাছ থেকে আর পেয়েছিলেন উগ্র সাহেবী মেজাজ,— স্বদেশীয়ানা বোকামি, কংগ্রেস বাজে, ত্যাগ মানে কাপুরুষতা, জীবন মানে ভোগ।

শীতের রাত ভোর হয়। মা উঠে চা'য়ের জল চড়ান। মেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে যেতেই মা বলেন—

"তোমার এক্ষুনি উঠতে হবে না। বাইরে কোয়াশা—বিষম ঠাণ্ডা। চা' এখানে এনে দিচ্ছি, একটু রোদ উঠুক তবে উঠো।"

বাধ্য শিশুটির মত কমল শুয়ে পড়ে। শীতের কুজ্ঝটিকার ঘন পর্দ্দা সূর্য্যদেবের সোনালী শরপুঞ্জ কি করে শতচ্ছিদ্র করে এসে ধরণীর বুকে লুটিয়ে পড়ে তা কমলার দেখা হয় না। তা সেজন্য ওর দুঃখ নেই কেন না কোনোদিনই সে মায়াময় ছবি ওর চোখে পড়তে পায়নি।

কমলের বয়েস সতের। কিন্তু আধফোটা ফুলের মতো কিশোরীর ছাঁদ ওর তনুলতাকে ঘিরে এখনও রয়েচে।

সাড়ে আটটায় মেয়ে বই খুলে পড়তে বসে। কমল একটা পাশ দিয়েচে। এখন আই, এ, পড়ে।

ঢং ঢং করে' গির্জ্জার ঘড়িতে ন'টা বাজতে মা এসে বলেন "মা লক্ষ্মী এবার নাইতে যাও। ইস্কুলের বাস্ এলো বলে?"

"আজ যে রবিবার মা।"

"ওমা ভুলেই গেছলুম যে আজ রবিবার। তা বেশ ঘণ্টাখানেক আরো পড়তে পার। দশটায় নাইতে যাবে।

"আচ্ছা"—বলে ঘাড়নেড়ে কমল দুলে দুলে আর একঘণ্টা পড়তে থাকে।

নেয়ে খেয়ে এলে মা বলে, "এবার একটু শোও কমল। ঘুম থেকে উঠে কিন্তু কালকের সেলাইটা সেরে রেখো।"

কমল ঘুমোয়; ঘুম থেকে উঠে সেলাই সেরে রাখে।

কমল যখন ঘুমোয় মাও এসে আস্তে আস্তে ওর পাশখানিতে শোয়, কন্যার নিবিড় কালো চূলগুলি আঙ্গুল দিয়ে চিরতে চিরতে তার ঘুমন্ত চোখ দুটির পানে চেয়ে থাকেন। দীর্ঘায়ত নয়নপল্লব ওর শুভ্র গণ্ডের উপর সূক্ষ্মরেখায় লুটিয়ে পড়েচে। চেয়ে থাকতে থাকতে মায়ের চোখে কি নিবিড় মোহের ছায়া ফুটে ওঠে। আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে মেয়ের চুলের ঘ্রাণ নেন, নিঃশব্দে ললাটে একটি চুম্বন এঁকে দেন। তন্দ্রাজড়িত চক্ষে কমল পাশ ফিরে শোয়।

বিকেল পাঁচটায় পাশের ভদ্রলোক ডক্টর চৌবের বাড়ীর উঠোনে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার জন্য কমলের নিমন্ত্রণ। কমল জিজ্ঞাসা করে 'কোন্ কাপড়টা পরে যাবো মা?" "হল্‌দে ডুরেটা পর।"

"ছাই হল্‌দে ডুরে। অত পাত্‌লা কাপড় পরে খেলা যায় না, কেমন যেন গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে যায়। বলি খান্ কয়েক মোটা কাপড় কিনি, তা তুমি দেবে না—সস্তাও হয়।"

মা মৃদু হেসে বলে "আচ্ছা, আচ্ছা বি, এ, পাশ করে' যখন মাষ্টারণী হয়ে রোজগার করবি তখন নিজের পয়সায় সস্তা মোটা শাড়ী কিনিস্, মার পয়সায় পাৎলা পরার কষ্টই সয়ে যা।"

কমল শাড়ী পরে' র‍্যাকেট নিয়ে আসে, কিন্তু মা সঙ্গে না গেলে তার খেলা হয় না। ভালোই লাগে না।

চৌবের বাড়ীর ল'নে সন্ধ্যায় মেয়েরা জট্‌লা করতে বসেচেন। কমল তার ক্ল্যাসমেট লীনার সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু দূরে যেতেই মা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে চ্যাঁচালেন "কমল এদিকে এসো—সন্ধ্যার সময় তুমি গেলে ঐ হাস্‌নাহেনার ঝাড়গুলোর কাছে,—যত সাপের বাসা।"

কমল চট্ করে ঘুরে দাঁড়ায়। লীনা ফিক্ করে হেসে বলে—"তুই ভাই তাজ্জব করলি, ঢের সুবোধ শিশু দেখেচি, তোর মতনটি দেখিনি। আচ্ছা শীতের সময় সাপ বেরোয়? মা'র কথায় তুই কথাটি কইতে জানিস্ নে।

জানুক চাই না জানুক, কমলা বন্ধুর কাছে ছোট হতে নারাজ ;—বলে "হ্যা জানি নে বৈ কি ? মা সেদিন বল্লে ছিল তোলা জুতো ভালো, আমি তো বল্লুম আমার নাগ্‌রাই বেশ ভালো লাগে।

লীনা হেসে কুটি কুটি। বলে "মস্ত মত তো জাহির করেচিস্।" একটু থেমে ফের বলে, "কিন্তু কৈ তোকে তো নাগরাই পরতে দেখি নি কখ্‌খনো।

কমলা বলে "মা কিনে দেয় না তা কি করব ?" লীনা আবার হি হি করে হেসে ওঠে। লীনা ওদের ক্ল্যাসের সেরা মেয়ে।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরতে ফিরতে পথে কমলা বলে, "লীনাকে ঐ হেলিয়োট্রোপ রংএর শাড়ী আর পিংক্ রংয়ের ব্লাউসটাতে বেশ মানাচ্ছিল, না মা ?"

মা মুখ ফিরিয়ে জবাব দেন "আহা—হা, তোমার যা পছন্দ—হেলিয়োট্রোপের ওপর অমন জম্‌কালো লাল বুঝি মানায় ? আরো যা মেয়ের গায়ের রং।"

কমল বন্ধুর স্বপক্ষে ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলতে চায়, কিন্তু অর্দ্ধোচ্চারিত সে কথা বোঝা যায় না। মা বলে চলেন—"ছোঃ হেলিয়োট্রোপের সঙ্গে পিংক্ এর সুট্ !"

কমলা রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবে তাইত হেলিয়োট্রোপের সঙ্গে পিংক্ কি করে মানায় মা বলেন, কিন্তু লীনাকে মন্দ দেখাচ্ছিল কি ?

পরদিন ইস্কুলে গিয়ে সেই জামাশাড়ীতে লীনাকে দেখে কমলার সত্যি মনে হয় হেলিয়োট্রোপের সঙ্গে পিংক্ সত্যি মানায় না। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক করে শেষটাতে মুরুব্বিয়ানার সুরে লীনার কাছে গিয়ে বলে "তোর হেলিয়োট্রোপের শাড়ীর সঙ্গে কিন্তু পিংক্ জামা তেমন মানায় না।"

লীনা সপ্রতিভ ভাবে জবাব দেয় কি করি ভাই, আমার তিনি জন্মদিনে এই স্যুট আমায় উপহার দিয়েচেন। পর রুচি পরনা—পরতেই হবে। তা ছাড়া এমন কিই বা রংয়ের গরমিশ। তা ও-কথা থাক। কিন্তু কাল ভাই শ'য়ের **Man And Superman** বইখানা পড়্‌লাম—কি চমৎকার! পড়েছিস্?

কমলা পড়ে নি। মা তাকে বাজে নাটক নভেল পড়তে দেন না পাছে মেয়ের মাথা বিগ্‌ড়ে যায়।

সন্ধ্যায় কলেজ থেকে ফিরে ওস্তাদজীর কাছে কমলার একটু সেতার শিখতে হয়, তবে তারপর খেয়ে দেয়ে মা'র বুকে মুখ গুঁজে কমলা ঘুমোয়।

মা ভাবতে থাকেন—এই মেয়েটি তাঁর, তারি রক্তমাংসে গড়া। সুদীর্ঘ সতের বছর তিনি একে গড়ে তুল্লেন—কমলা হচ্ছে তাঁর সম্পত্তি। গর্বে তাঁর বুক ভরে ওঠে, সেই অহমিকায় তিনি কিন্তু বোঝেন না কমলাকে তিনি ভাঙ্গচেন, গড়চেন না; ওর সত্যিকার অন্তরাত্মা তাঁর বলিষ্ঠ মনের নিরবচ্ছিন্ন চাপে পিষ্ট হয়ে যাচ্চে, স্ফূর্ত্তি পাবার তার সুযোগ হোলো না।

দিন এম্‌নি করে যায়। এম্‌নি করে কে জানে হয়তো চিরদিনই যেতে পারত, কিন্তু সুপ্রিয় ধূমকেতুর মতো এ ক্ষুদ্র সংসারটীতে আবির্ভাব হয়ে গোল বাঁধালে। সুপ্রিয় কমলার বাবার বন্ধুর ছেলে, এম্ এ পাশ করার পর থেকে ভবঘুরে। মা হারা ছেলে সে ; প্রাক্‌যৌবনে কোন্ কিশোরীর সঙ্গে ওর অশুভ সন্দর্শন হয়েছিল, তার স্মৃতি ব'য়ে ব'য়ে ও ঘুরে' বেড়ায়। ললাটে ওর গৈরিক সন্ধ্যার ঔদাস্য, দৃষ্টিতে ওর বর্ষণ ক্ষান্ত বাদল সন্ধ্যার বুকনিংড়ান বেদনার ছায়া।

কমলার বাপ মরার দু'বছর পরে হঠাৎ সে এসে হাজির— কমলাদের কানপুরের বাড়ীতে, বদ্রিনারায়ণ থেকে বাংলায় ফিরতি পথে। কমলের মাকে ও ডাকত আগে কাকীমা, এবার ডাকল 'মা'। পতিবিয়োগ বিধূরা বিধবার দুঃখ সুপ্রিয়র বুক জয় করে

কমলের মা'ও ওকে ভালোবাসলেন। কিন্তু এই অনাত্মীয়ের ভালোবাসাই ছিল ভালো। এই বন্ধনহীন যাযাবর ছেলেটিকে দেখে যে 'আহা' অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্বতঃই তার ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁর একদিন মনে পড়ল সুপ্রিয়রা তাঁদের পাল্টা ঘর ; কমলকে দিয়ে একে আরো আপনার করে নেওয়া যায় না ? তাঁর আরো লোভ বেড়ে গেল। সেদিন কল্‌কাতা রওনা হবার মুখে সুপ্রিয় খবর দিয়ে গেল, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শো দেড়েক টাকার একটা

চাকুরী জুটে গেছে। কমলের কানপুর থাকা এলাহাবাদ থাকা প্রায় একই কথা। কমলের বে দিয়ে তাকে ছেড়ে তিনি থাকবেন কি করে—যদি সে সুদূর বাংলাদেশে চলে যায়?

এলাহাবাদ থেকে কানপুর ঘণ্টাকয়েকের রাস্তা। সুপ্রিয় স্নেহের স্বাদ পেয়ে প্রায়ই কমলদের বাড়ী আসে যায়।

পূজোয় সুপ্রিয়র ছুটি। অত টাকা খরচ করে বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয় না। আর যাবেই বা কার টানে? এক বাপ; তিনি তো টো টো করে তাঁর কাজে ডাকবাংলাতে ডাকবাংলাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বোন নেই। একটি মাত্র ভাই, সে মেডিক্যাল কলেজে; কল্‌কাতা ছেড়ে এক পা তার নড়বার জো নেই। ছুটির পরদিন শরতের উজ্জ্বল প্রভাতে ওর কমলের স্নিগ্ধ মুখখানি মনে পড়ে। অনবদ্য সৌন্দর্য্য সে মুখে নেই, তবু অচপল তার গতি, ব্রীড়াকুণ্ঠিত তার ভঙ্গিমা, পলকহীন তার দৃষ্টি—একটি মিষ্ট শান্ততায় তার সর্ব্বাঙ্গ ছাওয়া। সুপ্রিয় জানে সে বে করবে না, মেয়ে মানুষকেই সে বিশ্বাস করে কম, তাদের অপদার্থতার পরিচয় সে বহুবার পেয়েচে। কত লেখা পড়া জানা মেয়ে পর্য্যন্ত সে দেখ্‌ল, তুচ্ছ খুঁটিনাটি ছাড়া তাদের দৈনন্দিন চর্চ্চা নেই;—কার রং ভালো, কার ক'টি ছেলে মেয়ে, গয়নার কোন ডিজাইনটা চমৎকার, শাড়ীর কোন রংটা পছন্দসই! কমলও নিশ্চয় তার চাইতে তফাৎ কিছু হবে না; তথাপি প্যাহাড়ী চাকরটার পরিবর্ত্তে ঐ শান্ত মেয়েটি ঘুরঘুর করে' তার

জনবিরল বাসায় এ ঘরে ও ঘরে বেড়াচ্চে, আর তাকে নিবিড় করে ভালোবাসচে এ চিন্তাটি সুপ্রিয়র বড় মিঠে লাগল। শরৎ প্রভাতের ঠাণ্ডা হাওয়া আর সোনালী আলো ওকে ক্ষেপিয়ে দিলে; সেদিন বিকেল বেলা মনকে নিছক এই বুঝিয়ে ও কানপুর চ'ল্ল যে কমলের মার মিঠে রান্না খাওয়াই ওর একমাত্র উদ্দেশ্য।

কমলদের বাসায় পৌঁছে সুপ্রিয় দেখে কমলের মা বাড়ীতে নেই চৌবের বাড়ীতে কি একটা সেলাই নিয়ে গিয়েচেন। হ্যাণ্ডব্যাগ টেবিলের উপর রেখে ও ধপাৎ করে একটা চেয়ারে বস্‌ল। একবার ভাবল কমলকে ডাকে, আবার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল; বিশেষতঃ কমল তার সাম্‌নে বড় বেশী বেরোয় না, আর কথা যে কয়টি কয়েছে তা তো হাতে গ'ণা যায়।

মিনিট দশেক পরে কিন্তু কমলা এলো। ঘাড় নোয়ান— তেম্‌নি অভ্যস্ত মাটির পানে চাউনি। আস্তে অস্ফুটে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"মা এক্ষুণি এল বলে, আপনি কি চা খাবেন এখনি ?"

এত নীচু ওর অওয়াজ যে সুপ্রিয় কথা ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লে না বল্লে,—"কি বল্লে একটু জোরে বল, শুন্‌তে পাচ্চি নে।" তারপর কমলের প্রশ্ন ভাল করে শুনে জবাব দিলে ছোট্ট একটি কথায়—"না"।

অতিথি চা খাবেন না জেনে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ একটা কায হতে অব্যাহতি পেলো এম্‌নি ভাব নিয়ে কমল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে

গেল, এবং দরোজার কাছে গিয়ে অত্যন্ত ত্রস্ততায় মেজের উপরে রাখা একটা ঘটি ঝন্ ঝন্ পা দিয়ে উল্টে ফেলে পালালো।

সুপ্রিয় মুচ্‌কি হাস্‌লে।

কমল এতদিন সুপ্রিয়র পানে ভালো করে চেয়েও দেখে নি। একে তো সুপ্রিয় পুরুষ মানুষ তারপর বয়সে ইয়ং। মা'র কাছে কমলা মিথ্যা শিক্ষা পায় নি। ওর পানে ভালো করে তাকাবার দুঃসাহস তার কি করে হবে! কিন্তু দিন কুড়ি পূর্ব্বে ওর এক মাসতুতো বোনের কাছে কমল জেনেছে মা'র নাকি ইচ্ছা সুপ্রিয়কে তিনি জামাই করেন। সেই থেকে মনে ওর একটা তোলপাড় সুরু হয়েচে। ভয়ও যে একটু না হচ্চে এমন নয়;— মানুষটি সময় সময় একা একা ঘরের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি করে কাটিয়ে দেন? আবার সময় সময় যা গম্ভীর হন দেখে সত্যি আশঙ্কা হয়। লেখাপড়া নিয়ে বসলেন তো লিখেই চলেচেন; একদিন হঠাৎ দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্‌তে ও দেখেচে সুপ্রিয়র ঘরে সজোরে আলো জ্বল্‌চে, রাত্রির নিস্তব্ধতায় তার কলমের খস্ খস্ শব্দ পর্য্যন্ত বারান্দায় ভেসে আস্‌চে! অদ্ভুত মানুষ। বেঁটে, কালো, অতি কদাকার না হলেও দেখ্‌তে ভালো নয় তো মোটেই। বেঁটে মানুষ কমল দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। তারপর লোকটির আর একটা জিনিষ সে বোঝে না—ওর চোখের কি এক সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি! 'উদভ্রান্ত' কথাটা তার মনে এলে হয় তো সে তাই বল্‌ত, কিন্তু কথাটা মনে পড়ে নি; শুধু

সে বুঝেচে ঐ দৃষ্টির মানে সে বোঝে না। একেই বে' করতে হবে? তা মন্দই বা কি?—চমৎকার বাঁশী যা বাজান, এম্-এ পাশ তো বটেই, আর সব চাইতে বড় কথা মা'র ইচ্ছে। মা যা ভালো বোঝেন তা নিশ্চয়ই ঠিক, এঁকে বে' করলে সে অসুখী হতেই পারে না,—হোক্ না অদ্ভুত।

পূজোর ছুটিতে কথায় কথায় একদিন কমলের মা মেয়ের বে'র কথা পাড়েন। সবশেষে বলেন, "যদি বল তো তোমার বাবার কাছে লিখি।"

সুপ্রিয় বলে "কিন্তু মা, তার পূর্ব্বে আমি কমলের সাথে আগে একটু কথাবার্ত্তা কয়ে দেখ্তে চাই।"

মুখ একটু ভার করে কমলের মা বলেন, "তার সঙ্গে আবার তুমি কি কথা কইতে চাও? আমি তার মা হয়ে কথা দিচ্ছি এর চাইতে স্থির কথা কি হতে পারে?"

সুপ্রিয় হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে হঠাৎ মুখ তুলে জবাব দেয়, 'তা বটে; তবু কমল বয়ঃস্থা হয়েচে, লেখা পড়া শিখেচে, ওঁর একটু স্বাতন্ত্র্য হয়েছে, ওঁকে আমি নিজে জানবার একটু সুবিধা না পেয়ে বিয়েতে মত দিতে পারি নে।

এটা ব্রাহ্মসমাজ নয়, হিন্দুর ঘর, আজকালকার ছেলেদের সবই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড, দু'চার মিনিটের কথাবার্ত্তায় একটা মানুষকে কতটুকু জানা যায় ইত্যাদি অনেক রকম আপত্তি তুলে কমলের মা শেষ পর্য্যন্ত সুপ্রিয়র একগুঁয়েমীতে বিরক্ত হলেও

নিমরাজী হয়ে বল্লেন, "আচ্ছা নেহাত কি জিজ্ঞাসা করতে চাও করতে পার, কিন্তু জেনো আমার মতেই মেয়ের মত ; কমলের ভিন্ন কোনো মত নেই। এ কথা তুমি তার সঙ্গে কথা বল্‌তেই বুঝতে পার্‌বে।"

পূজোর ছুটির শেষ দিন কমলের মা সন্ধ্যাবেলা কি কাজের অছিলায় ও বাড়ী গেলেন। সেদিন শরতের শুক্লা একাদশী, জ্যোৎস্নার বাণ ডেকেচে। সুপ্রিয় বাইরে একখানা চেয়ার টেনে কত কথা ভাবছিল। আজ তার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের জীবন যেন দুর্ব্বিষহ বোধ হতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ কি ভেবে ভেবে সে হঠাৎ ডাক্‌লে—"কমলা—"

কমলা ঘরের ভেতরে বসে কি খুটিনাটি কচ্ছিল। হোক্‌না বাইরে তরল জ্যোৎস্না—উনি যে রয়েচেন। ভেতর থেকে উত্তর দিল "অ্যাঁ"—

"এই গরমে ঘরের ভেতরে ব'সে ব'সে কি ক'চ্ছ।"

কমলা সত্য কথা বলে, বল্লে "কিচ্ছু না"

"তবে এখানে এসো না"

"আস্‌চি"—বলে, ছোট্ট একখানি মোড়া পেতে সে অদূরে বস্‌লে।

সুপ্রিয় শুধোলে,—তোমাদের কলেজ কবে খুল্‌চে ?"

"পশু´"। তারপর দু'জনাই চুপ্‌চাপ। প্রায় মিনিট পাঁচেকের পর হঠাৎ সুপ্রিয় বল্লে—"ছাখো কমল, কয়েকদিন

থেকে তোমায় একটা কথা বল্‌ব বলে ভাবচি। তোমার মার ইচ্ছা তোমায় আমাকে দেন, তোমার কোনো আপত্তি নেই ?”

কমল উত্তর দেয় না।

সুপ্রিয় বলে—“বল—”

কমল বলে—“জানি না”—

“জানিনে মানে ? আপত্তি আছে কিনা জানো না ? তবে এখানে আর একটু কথা আমার বলা দরকার। আমি এতকাল বিয়ে করিনি কেন জান ? আমি প্রথম যৌবনে এক জনাকে ভালোবেসেছিলুম, কিন্তু তাকে পেলুম না। তারপর এতদিন ভেবেচি, কি হবে একটা মেয়ের জীবন আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ? কিন্তু তোমায় জেনে অবধি ফের লোভ হচ্ছে, লোভ হচ্ছে তোমার মত একটি শান্ত মেয়েকে আমি নিরুপদ্রবে ভালোবেসে একটি নীড় রচনা করি, তুমিও আমার তৃষিত অন্তরখানিকে ভালোবাসা দিয়ে ভ’রে দাও। তোমায় সব খুলে বল্লুম এবার তোমার কি অভিমত জানতে চাই।”

কমলা চুপ।

“বল—”

“মাকে জিজ্ঞাসা কর্বেন।”

সাগ্রহ কণ্ঠে সুপ্রিয় শুধোলে “মাকে তো জিজ্ঞাসা করবই, একরকম করেইছি। তাঁর মনোভাব কি তুমিও এতদিনে বোঝো নি ? আমি, তোমার আপত্তি আছে কিনা জানতে চাই।”

ঐ এক উত্তর "মাকে জিজ্ঞাসা করবেন।" সুপ্রিয় ভেবে নিলে এ কুমারীর স্বাভাবিক লজ্জা। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়্ল কমলার গলার দামী মুক্তার মালাটিতে। তার মনে হ'ল সে দেড়শো টাকা মাইনের মাষ্টার; আজন্ম সুখ পালিতা এ বড়লোক ডাক্তারের মেয়েকে নিয়ে সুখী করতে পারবে কি? হঠাৎ আশা ভঙ্গের ভয়ে ভীত সুপ্রিয় দুই হাতে কমলার বাম বাহুখানি চেপে ধরে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লে—"আমি গরীব কমল, বড়লোক হতে কোনোদিন পারব না, কেননা চেষ্টাও নেই, ইচ্ছাও নেই। তুমি বড়লোকের মেয়ে, আমায় বে করলে তোমার নিজকে ছোট মনে হবে না তো?"

হয় তো বা সুপ্রিয়ের স্বরে ব্যগ্র ব্যকুলতার ধ্বনি, তার ত্রস্ত হস্তের মত্ত স্পর্শ, চাঁদের উজ্জ্বল আলোর মোহ কমলের অন্তরবাসিনী গাঢ় সুপ্ত নারীটিকে এই আঠার বছর বয়সের মধ্যে প্রথম বার অর্দ্ধ সচেতন করে তুল্লে; তাই সে এক অদ্ভুত উত্তর করে বসল "টাকা পয়সায় কি যায় আসে?"—অথচ কমল জান্‌ত যে যে-মানুষের মটর-কার আর bank balance নেই মা'র চোখে সে মানুষ হিসাবে নেহাত অযোগ্য। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে এই—স্বামী মরে গেছেন, কাণপুরের ধারে অমন ঘর আর মনের মতন ছেলে তিনি পাবেন কোথায়?—তাই সুপ্রিয়কেই তাঁর পছন্দ হ'ল। ওকে হয় তো কতক স্নেহে কতক চোখ রাঙিয়েও প্রয়োজন হলে হাতে রাখা চল্‌বে এ-কথাই তিনি ভেবেছিলেন।

"টাকা পয়সায় কি যায় আসে ?"—জবাব শুনে সুপ্রিয়র প্রতি লোমকূপ আনন্দের শিহরণে বেদনা করে উঠ্‌ল। সে দু'হাতে কমলের মুখখানি টেনে এনে ঘাড়ে একটী চুমো দিয়ে ছেড়ে দিলে, মুখখানি চুমোয় ছেয়ে দিতে ইচ্ছা হলেও সাহস হোলো না। কিন্তু ও ভেবে নিলে নিশ্চয় কমলা তাকে ভালবাসে, নৈলে এমন জবাব দেয় ? নৈলে, সব চাইতে অব্যর্থ প্রমাণ—এত শান্ত হয়ে তার চুম্বন গ্রহণ করে ? কিন্তু মুর্খ সুপ্রিয় তার ঠোটে চুমো দিলে টের পেত সে ওষ্ঠ কি বরফের মত ঠাণ্ডা ! চুমো কমল ওর নিয়েচে বটে কিন্তু সে পাথরের পুতুলের মত। সুপ্রিয়ের অতীত জীবন যাই হোক না সে গরীব, তবু মা তাকেই পছন্দ করেচেন, কমল তা জানে। বাস্ তাই কমলের পক্ষে যথেষ্ট।

কমলের মা ফিরে আস্‌তেই সুপ্রিয় বল্লে—"আচ্ছা আপনার কথাতেই হবে মা, কমলকে আপনি আমায় দিন। আপনার অনুমতি হলেই হয় !

সুপ্রিয়র হঠাৎ এ উক্তিতে মা একটু হকচকিয়ে যান। মেয়ে ঘোড়া ডিঙ্গায়ে ঘাস খেলো কি না সন্দেহে কমলার পানে স্থির দৃষ্টি ঢেলে মা বলেন "আমার আবার অনুমতি কেন ? তোমরা বড় হয়েচ তোমাদের মত হলেই যথেষ্ট।" সে দৃষ্টির ধারের নীচে কমলার মাথাটা বুকের ওপর আরো ঝুকে পড়ে।

সুপ্রিয় বলে—"কমল আপনার ওপরই সব ছেড়ে দিয়েচে, নিজে কিছু বল্‌তে চায় না। আপনি অনুমতি দিন তবেই হবে।"

মা'র মুখ বিজয় গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলেন, "বলেচি না, আমার মেয়ে আমার কথা ছাড়া কোনো কাজ করতে পারে না। আমার সম্মতি না থাকলে ওর কাছে তুমিও যা, রাস্তার যে কোনো একজন লোকও তাই।"

সুপ্রিয় মনে মনে হাসে, কমলের মা যদি এই কথা মনে করে' সুখ পান, ক্ষতি কি তাতে? সে তো জানে কমল তাকে ভালোই বাসে, নৈলে সে এমন উত্তর করে' তার বাহুবন্ধনে ধরা দেয়?—বোকা সুপ্রিয়—মূর্খ সুপ্রিয়।

একদিন বাছ্যভাণ্ড নিয়ে যথারীতি বিয়ে হয়ে যায়। সুপ্রিয় স্বপ্ন দেখে—এলাহাবাদে একখানা ছোট্ট বাড়ী সে ভাড়া ক'রেচে, তার চারিদিকে মেহেদির বেড়া দেওয়া। সামনের ছোট্ট সেজটিতে অপরাজিতা আর হেনার ঝাড়, দালানের সিঁড়ির দু'পাশে অজস্র সূর্য্যমুখীর বর্ণ সমারোহ। সকালবেলা ঝি জল গরম করে নিয়ে এলে কমল লাল মখমলের চটিজোড়াটি পরে' ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে নিয়ে চা তৈরী করে। তারপর দুজনায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজের টুক্‌রো সংবাদগুলি পড়ে। তারপর তার কলেজের পড়া তৈরী করতে যায়, কমল যায় হেঁসেলে বামুন ঠাকুরের রান্নায় মক্স করাতে। এটা, ওটা, ছোট খাট হুকুম করার ফাঁকে সে গুণ গুণ্ করে সুর ধরে "ঐ যে তোমার ভোরের

পাখী নিত্য করে ডাকাডাকি।” সাড়ে দশটা বাজলে কমল এসে ওর হাত থেকে বইখানা কেড়ে নেয়, বলে ১২টায় তোমার ক্লাস মনে আছে, মাষ্টার মশাই? সুপ্রিয় কৃত্রিম রাগ করে বই কেড়ে নিতে গেলে সে ধস্তাধস্তি পরিসমাপ্তি হয়—কমলের ঠোঁটে একটি চুমো দেয়। তারপর নেয়ে খাওয়ার পালা, এটা খাও, ওটা খাও, নয়তো মাথাখাও ইত্যাদির স্নেহের দৌরাত্য। সুপ্রিয় কলেজে চলে যায়, কমল ওর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে উঠে রবিবাবু কি ব্রাউনিংএর দুটো কবিতা পড়তে না পড়তেই সুপ্রিয় ফেরে—তারপর তারপর আরো কত কি।

সুপ্রিয়র ইচ্ছা হয় কমলকে শীগ্‌গিরই এলাহাবাদ নিয়ে আসে। কিন্তু তা হয় না; এবার ওর পরীক্ষার বছর, কমলের মা বলেন এখন এলে পরীক্ষা চুলোয় যাবে। সুপ্রিয়ও চায় না ওর এগ্‌জামিনটা মাটি হোক।

হঠাৎ পড়ল সুপ্রিয় জ্বরে। সাত দিনে তার জোর ধাক্কা সে সামলে উঠ্‌ল বটে কিন্তু জীর্ণ জ্বর তার দেহে রয়েই গেল। রোজ কলেজ থেকে ফিরতি পথে তার একশো আন্দাজ জ্বর আসে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে, বাড়ীতে আস্‌তে আস্‌তে তার চোখ মুখ ব’সে যায়, বিছানায় রাত ন’টা পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্ করে’ কাটালে তবে তার জ্বর ছাড়ে, চাকরের হাতের তৈরী চামড়ার মতো শক্ত দু’খানা রুটি খেয়ে সে শুয়ে পড়ে।

তপ্ত ললাটে কমলের হাতের ছোঁয়া পাবার জন্য ওর মনটা আকুলি বিকুলি করে কিন্তু কমলকে আসবার কথা লিখতে সুপ্রিয় সাহস করে না। কমলকে রেখে আসবার বেলা শ্বাশুড়ী বলে দিয়েচেন—কমলকে তিনি এ বছর ছেড়ে দেবেন না। সুপ্রিয়ও রেখে আসবার বেলা ভেবেছিল, তাইত মায়ের এক মেয়ে, থাক, মায়ের কাছে এক বছর থাকুক না।

রমেশ মিত্তির M. B. B. S. L R. C. P. বিলাত ফেরত ডাক্তার, সুপ্রিয়র বন্ধু। হঠাৎ একদিন সুপ্রিয়কে দেখে বলে—কিহে তুমি যে আধখানা হয়ে গেছ।

শুক্‌নো হেসে সুপ্রিয় বলে, গেছি'।

রমেশ নাছোড়বান্দা। উল্টে পাল্টে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে দস্তুরমত এক ঘণ্টা পরীক্ষা করে' সুপ্রিয়কে বল্লে, বুঝ্‌লে তোমার **complete nervous break down** হয়েচে, অষুধের চাইতে এখন বেশী চাই তোমার শুশ্রূষা এবং পরিমিত আর নিয়মিত আহার। চাকরের হেফাজতে আর না থেকে এবার মা'কে নিয়ে এসো হে।

সুপ্রিয় মৃদু হেসে বলে ফরমায়েস দিয়ে একটা মা এবার গড়ালে তো পারি—

রমেশ বলে, "ওঃ বাইজোভ, একদিন বলেছিলে বটে তোমার মা নেই। ভুলে গেছ্‌লুম। যাক্ গে, মা নেই বৌকে আনো হে। এগ্‌জামিন দেবেন না তিনি বুঝি এবার—সে দিন

বল্‌ছিলে? কিন্তু ভায়া এগ্‌জামিনের সময় পেরিয়ে যাবে না, কিন্তু তোমার শরীরটি ভালো না হলে বিষম ট্র্যাজেডি। না হে ওসব নয়, নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি গিন্নীকে।"

সুপ্রিয় বল্লে, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে অকারণ ওদের disturb করা—

রমেশ বাধা দিলে, বল্লে, Thousand times প্রয়োজন আছে; জানো আমি ডাক্তার।

এ বছর আসবার কথা নেই, হঠাৎ ওকে আনাতে চাইলে ওরা কি মনে করবে!

খুব ভালো মনে করবে। জানো সেবার আমার যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় শ্রীমতী তার ভায়ের সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণে গেছ্‌লেন। ফিরে এসে যেই দেখ্‌লেন আমি সেরে গেলেও শুকিয়ে কাষ্ঠ হয়ে গেছি, সে কি কান্না! কসুরের মধ্যে আমার হচ্চে এই এত বড় ব্যামো আমার গেল, ওঁকে কেন খবর দিই নি! আমি হাজারো বার বল্লুম—কিই বা এমন অসুখ হয়েছিল। তা কার কথা কে শোনে! বুঝ্‌লে হে, এসময়ে তাঁরা এলে অ-খুসী হবেন না, তোমার ভয় নেই।

সে দিন আ-সন্ধ্যা সুপ্রিয় ভাবে, কমল কি আস্‌বে? রাত ন'টায় জ্বর ছাড়ার শ্রান্তির সময় ওর ভেবে আনন্দ হয় কমল আস্‌বে। ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখে কমল এসেচে। পরদিন কমলের মাকে আর কমলকে এক খামে চিঠি দেয়—কিছুদিন হোলো

আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। আমার আহার বিহার সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ পরিচর্য্যার আবশ্যক, অতএব কমল এখানে এলে ভালো হয়। পুনশ্চে ফের লিখলে, পড়া শুনার তার বিশেষ ক্ষতি হবে না এখানে আমি ছাড়া আমার বন্ধুদের মধ্যে বিনে মাইনের ঢের ভালো ভালো মাষ্টার পাওয়া যাবে।

চিঠি পেয়ে কমলের মা'র বুক শুকিয়ে আসে। মেয়েকে তাহলে ছাড়তে হবে? এই ত বে দেওয়ার ফল। কিন্তু না— এ বুজরুকী,—এই ত সে দিনও চিঠি এলো শরীর বেশ ভালো আছে, তার দু'দিন পরেই এমনি ধারা দীর্ঘকাল ভোগানো অসুখের সংবাদ! তা ছাড়া তাঁর দুধের মেয়ে কমল রোগীর পরিচর্য্যা করতে জানেই বা কি? এখন তার হেসে খেলে বেড়াবার সময়, এই কি তার প্যানপেনে রোগীর খবরদারী করবার বয়েস? আর সবে এই বে'র বছর যাচ্চে; না, এখন তাকে পাঠানো যেতেই পারে না। উত্তরে কমলের মা লিখ্‌লেন, কমলের এখন গেলে পড়াশুনা মাটি হবে, তার যাওয়া হবে না। তুমি পূজোর ছুটিতে এখানে এসো—অসুখ সারিয়ে যেয়ো।

কমল ক্ষীণ প্রতিবাদ করে' বল্লে "আমার পড়াশুনার কোনো ক্ষতি ওখানে গেলে হবে না, মা।"

জীবনে কমলের মা যতবার আশ্চর্য্য হয়েচেন তার মধ্যে এই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যকর ঘটনা! কমল কিনা তাঁর মতের বিরুদ্ধে সাহস করে' কথা কয়?—এমন দিনও

এসেছে! শুষ্ক কণ্ঠে তিনি শুধু বলেন, "কি হবে না হবে তা আমি তোমার চাইতে ভালোই বোধ হয় বুঝি!"

কমলা চুপ করে। আপনাকে সহস্রবার ধিক্কার দেয়, কেন ও-কথা বল্‌বার দুর্ম্মতি তার হয়েছিল! সে যখন স্বামীর কাছে চিঠি লেখে মা তার পানে চেয়ে চেয়ে হাসেন। সে বোঝে কতকটা, সে হাসি বাৎসল্যরসসিক্ত, তার ব্যঞ্জনা হচ্ছে এই, "আমার দুধের মেয়ে কমলও যৌবনের স্বাদ পেলো!" কিন্তু তবু সে দৃষ্টির মধ্যে কি একটা যেন কাঁটার মতো খচ্‌ খচ্‌ ক'রে' তার প্রাণে বেঁধে! সে হাসি যেন বিদ্রূপও করে, "আচ্ছা!—এত টান এরি মধ্যে!" লজ্জায় তখন কমল মাটিতে মিশে যেতে চায় —ছি ছি মা কি ভাবচেন! দু'চারটা যা'তা' কথায় চিঠিটা শেষ করে ভাঁজ করে তা মা'র পানে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে "তোমার চিঠির ভেতরে এটা দিয়ে দিও।" উদ্দেশ্য, তাঁর চোখ পড়তেই যেন বোঝেন সে ঘটা করে প্রেমপত্র লেখবার মেয়ে নয়। নেহাৎ কর্ত্তব্যের খাতিরেই চিঠি লেখে। মা' কিন্তু না পড়েই চিঠিখানা খামে পোরেন। কিন্তু মনে মনে মুচ্‌কি হাসেন; তাঁর কমল বরের চিঠি যে তাঁকে পাঠিয়ে দিতে ব'লে খোলা ফেলে রেখে ইস্কুলে চলে যায় এই-ই তাঁর অধিকারের প্রমাণ। কমলা তাঁরই, আর কারো নয়!

সে দিন দুপুরে শ্রাবণের আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। কলেজে ছুটির ঘণ্টায় ছোট মেয়েগুলা যখন টিচারদের চোখের আড় হয়ে

শিল কুড়িয়ে খায়, তখন বৃষ্টির ধোয়াটে ধারার পানে চাইতে চাইতে একবার কমলের সুপ্রিয়র কথা হঠাৎ মনে পড়ে! সুপ্রিয় লিখেচে—"নির্জন নিরানন্দ গৃহে জ্বরের সময় যখন একা পড়ে থাক্‌তুম আমি কল্পনায় তোমার স্বেদসিক্ত ছোট্ট হাত খানির স্নেহকোমল স্পর্শ ললাটে অনুভব কর্ত্তুম। যখন সম্বিৎ হোতো,—বুকচিরে দীর্ঘশ্বাস উঠ্‌ত তুমি কাছে নেই; শিয়রে বসে ফোর্থ ইয়ারের ছেলে রামভকত হাওড়া ষ্টেশনে তোমার কেনা তালপাতার পাখাখানা দিয়ে হাওয়া কচ্চে।" কষ্টই বেচারীর হয়ত একটু হচ্চে। কিন্তু—কিন্তু আবার কি?—মার চাইতে সে ভালো বোঝে নাকি? এমন সময় ঢং ঢং করে গণিতের ক্ল্যাসের ঘণ্টা পড়ে, কমল লীলাদি'র ক্ল্যাসে যায়।

শ্বাশুড়ীর চিঠি লিখবার ধরণ দেখে সুপ্রিয় তাজ্জব হয়ে গেল। একটা চাপা জ্বালা যেন তার থেকে ঠিক্‌রে পড়চে,—"তার যাওয়া হবে না!" আজ প্রথমবার সুপ্রিয় ভাবতে লাগ্‌ল কমলের ওপর তার কিছু অধিকার আছে কিনা? আছে বৈ-কী?—সমাজ, সংস্কার এমন কি আইন পর্য্যন্ত তাকে অখণ্ড অধিকার দিয়েচে। কিন্তু তার পুরো দাবী আছে বলেই তো সে-দাবী সে কর্‌তে চায় না। শুধু আইন কানুনের জোরে কারু স্বাধীন ইচ্ছা ব্যাহত করার প্রবৃত্তি যেন ভগবান তাকে কোনো দিন না দেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়ে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সুপ্রিয়র কিছু চটাচটি হয়েই গেল। সুপ্রিয় ছেলে মানুষ নয়, সে বুঝত তাকে

কমলার ভালো লাগে কিন্তু সে তাকে ভালো এখনও বাসে না। সেই জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় যখন কমল তার বাহুবন্ধনে ধরা দেয়, সে তার প্রতি প্রেমের জন্য সে দেয়নি, দিয়েছিল মাতৃইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে, কতকটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব একটা রসাবেশে। তার পর থেকে সুপ্রিয় কমলের মধ্যে কেমন একটা তুহিনশীতল স্পর্শ মাত্রই পেয়েছে, নারীর প্রথম প্রেমের তীব্রতা ও উষ্ণতার স্বাদ পায়নি। কমল এ প্রসঙ্গে লিখেচে, "তুমি আমায় যতই ভালোবাসো মা'র সঙ্গে এম্নি করে ঝগড়া করলে আমার ভালো লাগবে নাকি? এখন এখানেই থাকি না—তু'দিন পরেই যাব —মা যখন বল্‌ছেন!"

মা-মেয়ে কেউ তার অসুখকে আমল দিতে রাজি নয়!...শেষ পর্য্যন্ত বিরক্তি, হতাশায় সুপ্রিয় লিখলে "প্রয়োজনের ডাকে যখন আপনার সাড়া পেলুম না, তখন আমি আর কমলকে ডাক্‌ব না। যখন খুসী আপনাদের ও আস্‌বে, যখন খুসী চলে যাবে।"

মাসের পর মাস যায় কমল আসে না। তারপর একদিন ডাক্তারে বলে—সুপ্রিয়র ক্ষয় রোগ হয়েছে। তার পাহাড়ে যাওয়া চাই, সেখানে পাইনের হাওয়ায় নাকি উপকার হতে পারে। সুপ্রিয় যায় আলমোড়া, ছোট্ট একখানা বাড়ী ভাড়া করে বুড়ী পিসিমাকে নিয়ে থাকে। বুড়ী তাকে আশৈশব মানুষ করেচে, সে তাকে ফেলতে পারে না। খবর পেয়ে সুপ্রিয়র বাবা আসেন, বলেন—'বৌমাকে আনি।' সুপ্রিয় তাঁর পায়ে হাত

দিয়ে বলে, 'ঐটি করবেন না।' ক্রমে পিতা একে একে সব কথা জেনে নেন,—নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাঁর এমন সোনার ছেলে, এই দুঃখ নিয়ে সংসার থেকে বিদায়ই নিতে যাচ্চে বা!

পাহাড়ে এসে সুপ্রিয় একটু ভালো হ'ল। বাবা ফেরবার পথে ডাক্তারের কথায় মাসখানেকের জন্য একটি নার্স রেখে দিয়ে ফের সরকারী কাজে গিয়ে ভিড়লেন। আর রৈল পাহাড়ে পুরাণা চাকর এবং বুড়ী পিশিমা।

কমল আর তার মা কিছু জানে না—সুপ্রিয় এহেন কঠিন রোগ নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটির অল্পদিন পূর্ব্বে সুপ্রিয় তাঁদের শেষ চিঠি লিখেছিল, কমলের মা চিঠিপত্র, খোজখবর আর কিছু না পেয়ে ভাবলেন রাগ করে সুপ্রিয় ছুটিতে হয়তো সোজা দেশে চলে গেছে। দাঁতে ঠোঁট চেপে বল্লেন "আধময়লা মোটা ধুতি পরা মাষ্টারটির রাগ আছে—বিষের সঙ্গে নাম নেই কিন্তু কুলোপনা চক্র!" সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা তাঁর নূতন করে আফ্‌শোষে কাট্‌ল। একান্ত বাধ্য একটি জামাতা পাবার লোভে তিনি কত ভালো ভালো পাত্র ফেরালেন, শেষকালে মেয়ের অদৃষ্টে জুটল কিনা এই বাঁদরটা! সেই মিষ্টার মৈত্রর ছেলের সঙ্গে বে' দিলে মেয়েটা অ্যাদ্দিনে 'রোল্‌স্ রয়েস' গাড়ীতে হাওয়া খেয়ে বেড়াত!

সুপ্রিয়'র নার্সটি বেশ চালাক চতুর, কর্ম্মনিপুণ তো বটেই। ঘড়ি ধরে রোগীকে ওষুধ পথ্য দেয়, টেম্পারেচার চার্ট রাখে,

ভুল !

বিকেলবেলা ঠেলাগাড়ীতে করে স্থপ্রিয়কে হাওয়া খাওয়ায়, আরো কত কি করে। এতো সব—নার্স'ই করে। কিন্তু লুসি বোস শুধু তাই করে না, দিনের সমস্ত কাজে একটি চোখে যেন ওর রোগীর ওপর সব সময় পাতা থাকে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে, বুঝি ওর বাপ বাঙ্গালী ছিল বলেই স্বদেশবাসী এই মরণের যাত্রী রোগীটিকে ও এত স্নেহ করে। যখন কোনো কাজ থাকে না, নিস্তব্ধ দুপুরে যখন পিশিমা লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোন তখন লুসি ব'সে আস্তে আস্তে স্থপ্রিয়র পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। তখন কোনদিন বা আরামে তা'র চোখ বুজে আসে, কোনো দিন সে লুসির সঙ্গে নীচু গলায় গল্প জুড়ে দেয়, বলে "লুসি, তুমি আর জন্মে আমার নিশ্চয় কেউ ছিলে, নৈলে এত যত্ন করতে পারতে না।"

লুসি ফিক্ করে হেসে বলে "ছিলুম হয় ত।" লাল টুক্‌টুক্ ঠোঁট দু'খানির ভেতর দিয়ে ওর ধব্‌ধবে সাদা ছোট্ট ছোট্ট দাঁতগুলি চিক্‌মিক্ করে ওঠে।

লুসির মুখের গড়ন তেমন ভালো নয়, কিন্তু রং বেশ ফর্সা, টানা টানা চোখ দুটি যেন বেদনার রসে ভরপুর। দেহে অটুট্ট যৌবনের স্বাস্থ্য।

স্থপ্রিয় ওর পানে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে "রোগীর কথায় দোষ নিওনা লুসি; মুখখানি তোমার এমন

কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে তা কত ভালো যে লাগে কি বল্‌ব ! চোক ফেরাতে ইচ্ছা করে না।"

লুসির গাল দুটি একটু রঙিয়ে ওঠে, কিন্তু তখনই শান্তকণ্ঠে বলে "সে আপনি স্নেহ করেন বলে।" তারপর নীচু করা মুখ হঠাৎ দেয়ালের ঘড়িটার পানে তুলে বলে "একটা বাজ্‌ল, ওষুধ দি।"

ওষুধ খাইয়ে, আঙ্গুল জলে ভিজিয়ে রোগীর ঠোঁট দু'খানি প্রথমে মুছে পরে তোয়ালে দিয়ে কপালের পাৎলা ঘামটুকু আস্তে আস্তে মুছে নেয়। তারপর Morris এর কাব্যগ্রন্থখানা নিয়ে ওর শিয়রের ধারে ব'সে একহাতে আস্তে আস্তে মাথায় হাওয়া করতে করতে বলে "পশু Atalanta's Race পড়ে শুনিয়েছিলুম, খুব ভাল লাগল বল্লেন, আজ আবার Morris থেকে কিছু পড়ে শোনাব ?"

ঝিরঝির হাওয়ায় চোখ বুজে সুপ্রিয় বলে, "পড়।" লুসি পড়ে Defence of Guinevere। সুপ্রিয় শুনতে শুনতে ভাবে, কমল যদি আজ ওকে এমনি করে শিয়রের ধা'রে ব'সে বই পড়ে শোনাত ! এ চিন্তায় মুহূর্ত্তেক আত্মবিস্মৃতির পরে তিক্ততায় ওর চিত্ত ভরে ওঠে, জোর করে চোখ মেলে লুসির মুখের পানে তাকায়। কি সুন্দর লুসির আবৃত্তি, ও সত্যি কবিতা ভালবাসে। কমল এতক্ষণ এখানে বস্‌লে হয়ত গল্প সুরু করত, বুটাদার শাড়ী পরলে মিসেস্ চৌবেকে কি বিশ্রী দেখায়

হঠাৎ সুপ্রিয় বলে "আজ আর থাক্।"

চমকে বইয়ের মধ্যে বাঁ হাতের তর্জ্জনীটা দিয়ে বই বন্ধ করে ঝুঁকে ব্যগ্রকণ্ঠে লুসি শুধোয়,"আজ ফের জ্বরটা বাড়চে, বুঝচেন না কি ?"

"না।…তুমি শুধু তোমার হাত দুখানি আমার কপালের ওপর রাখ।…আঃ কি ঠাণ্ডা।

আরো এক সপ্তাহ কাটে। রোগীর উন্নতিও নেই, না অবনতি।

একদিন সন্ধ্যায় বাড়ীর সামনের খোলা অবন্ধুর ছোট্ট অপরিসর জমিটুকুতে লুসি সুপ্রিয়কে ঠেলা গাড়ীতে ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্চে, এমন সময় সুপ্রিয় বল্লে, "লুসি আমার একটা কথা মনে কি হয় জানো ?" "কি ?"

"সত্য কি মিথ্যা জানি নে ; কিন্তু তোমার পানে চাইলেই আমার মনে হয় জীবনে তুমি যেন মস্ত বড় দুঃখ একটা পেয়েচ। আর সেই দুঃখ যেন তোমার মাথার মণি হয়ে তোমার প্রাণটিকে এত মধুর করেচে।"

লুসি হেঁটে চলে, কথা কয় না। সুপ্রিয় ফের বলে, "বল না ? তোমরা ইতিহাস কিছু শুনতে চাইবার মতো ধৃষ্টতা আমি করব না। জানতে শুধু কৌতুহল হচ্চে—আমার আন্দাজটা ঠিক কি না।

লুসি বলে, "দুঃখ কার জীবনে না আসে সুপ্রিয় বাবু ?"

"না, আমি সাধারণ দুঃখের কথা বল্‌চি না, এমন বেদনার কথা বল্‌চি যা দেহ মনের ওপরে একটা সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যায়।"

লুসি মুখফিরিয়ে বলে, "হয় ত এসেছিল, সে সব কথা আর একদিন বল্‌ব।"

কিছুক্ষণ দু'জনাই নীরব থাকে। তারপর আস্তে লুসির হাতের ওপর হাত রেখে সুপ্রিয় বলে,—"নিজে আমি জীবনে বেদনা পেয়েছি বলেই হয় তো তোমার মধ্যেও লুকানো বেদনার কথা আমার কাছে চাপা থাক্‌ল না।"

লুসি প্রত্যুত্তরে কিছু বলে না; সে একদিন পিসিমার সঙ্গে কথায় সুপ্রিয়র স্ত্রী-ভাগ্যের আঁচ পেয়েছিল।

ফের সুপ্রিয়ই একটু থেমে আরম্ভ করে, "জানো লুসি সেই সুদূর কৈশোরে আমি একজনাকে ভালোবেসেছিলাম। সে তোমারই মত একবার টাইফয়েডে আমার শুশ্রূষা করেছিল। তারপর সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহে নিয়ে ষোলো বছর বয়সে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। দশ বছর সে ভাঙ্গা স্বপনের পসরা বয়ে বয়ে তারপর যখন একখানি শান্তিময় নীড় বাঁধবার জন্য বোকার মতো বে' করলুম,—এবারো স্ত্রী আমার গৃহিণী হ'তে এলেন না। মরণের পথে হয়ত চলেছি তবু সে তার আত্মাভিমান নিয়েই রৈল।"

এবার লুসি বল্লে, এই খানেই কি গল্পের শেষ নাকি?

"কে জানে? সময় সময় দুঃখ হয়, চিত্ত আমার এত উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, কমলা—আমার স্ত্রীকে—পাবার জন্য, তবু পেলেম না কেন? আমি ওর অযোগ্য ছিলুম কি? এক কটা চামড়া ছাড়া ওর কিছুইত আমার চাইতে বেশী গর্ব্ব করবার ছিল না। তারপর বুঝলুম যোগ্যতা অযোগ্যতার ওপর ভালোবাসা নির্ভর করে না। কার মধ্যে কি বস্তুটি যে কার ভালো লাগে—এ এক রহস্য। আমার মধ্যে ভালোবাসার কিছু ও হয়ত খুঁজে পায় নি।" একটু থেমে বলে, "এতে আমার দুঃখ করবার থাকলেও লজ্জা করবার কিছু নেই, না লুসি?"

লুসি বলে, "না"।

"কিন্তু তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে লুসি, ওকথা ভেবে দুঃখও আমার আর হয় না। কিন্তু তবু জানো, আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবেসেছিলুম।

"তার মানে এখন বাসেন না?"

"না—যে আমার সমস্ত চিত্ত দু'পায় মাড়িয়েচে, ফিরে চেয়ে দেখে নি, তার জন্য ভালোবাসা থাকে কি করে?"

লুসি মৃদু হেসে জবাব দেয়, "কিন্তু পড়েচেন তো—

"Love is not love,
Which alters when it alteration finds
Or bends with the remover to remove?"

সুপ্রিয় বলে, "ওসব সেক্সপীয়রী যুগের নাটুকে কথা। ছুনিয়ার আর সব জিনিষের মতো ভালোবাসার উৎপত্তি, স্থিতি, ক্ষয় আছে। তবে একথা ঠিক, যোগ্যে যোগ্যে মিশ্‌লে এর স্থিতি বহু বহু দিন, হয়তো চিরজীবনও হতে পারে। একটু চুপ করে ফের বলে "তোমার কি মত লুসি ?"

লুসি বলে "আমার কোনো মত নেই, কারণ আমি হয়তো কাউকে ভালোবাসিনি। কথা যখন উঠ্‌ল তখন আমিও বলেই ফেলি—আমার ক্ষুদ্র ইতিহাস। মা আমার দশ বছরে মারা গেলে বাবা মদ ধরেন ও পনের বছর বয়সে এক লম্পটের কাছে প্রায় আমায় বিক্রী করেন—অর্থাৎ টাকা নিয়ে আমায় সম্পূর্ণ অমতে বিয়ে দেন। তখন আমি **Senior Cambridge** দেবো। পরীক্ষা হোলো না। বছর ঘুরতে মা হলুম, ছ'মাস পরে লিভার পচে ম'লেন বাবা, একটা গণিকা গৃহে মল স্বামী। ছেলেটা এক বছর পরে বাসি বকুলের মতো ঝরে গেল। মা হবার ক্লান্তিটুকু পেলুম কিন্তু শান্তিটুকু পেলুম না। সেই থেকে আমি নার্স।"

শুনে সুপ্রিয় অসাড়ে ব'সে রৈল—যেন সম্বিৎহারা। এই পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখের কাছে ও কষ্ট কতটুকু? মরুভূমিতে ধূলির একটু কণামাত্র নয় কি ?

* * * *

সুপ্রিয় শেষ পর্য্যন্ত সেরেই উঠ্‌ল। তার বাবা লিখেচেন নার্সকে আর প্রয়োজন না থাকলে ছাড়িয়ে দিতে। কিন্তু

লুসিকে আর প্রয়োজন নাই এ সুপ্রিয়র মনে মান্‌তে চায় না। যার প্রয়োজনের কারণ খুজে পাওয়া যায় না সেই সব চাইতে তার বড় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। লুসি গেলে কে অমনি করে তাকে নাওয়াবে, খাওয়াবে, অবসর সময়ে ব'সে বই কাগজ পড়ে শোনাবে, অনবসরে সাত পাঁচ কাজ নিয়ে তার রাঙাপেড়ে শাড়ীর আঁচলখানি দুলিয়ে এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে বেড়াবে? না লুসিকে তার এখনো চাই।

একদিন লুসিই বলে, "তবে আমায় বিদায় দিন"।

সুপ্রিয় অনেকদিন থেকেই কথাটা ভাবচে, কিছু কুল কিনারা পায় নি। হঠাৎ বলে, "যাবে?—তোমার যেতে ইচ্ছা হবে?"

লুসি হেসে বলে "আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ, দ্বিতীয় প্রশ্ন অবান্তর"।

সুপ্রিয়র চোখ জলে ভরে আসে, বলে, "দেখ্‌চ তো আমি এখনও কত অসহায়, আমায় ফেলে তুমি যেতে পারবে?"

"আচ্ছা বলেন তো আরো দু'চার দিন থাকি।" অনেকক্ষণ চুপ থেকে সুপ্রিয় বলে, "লুসি, তুমি আমায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছ, একটা কথা বল্লে তুমি রাগ করবে না?"—"না"

"তোমায় আমি ভালোবাসি, তোমায় নৈলে আমার চলবে না।"

লুসি শান্ত স্বরে জবাব দিল, "প্রথম কথাটা অনেকদিন থেকেই জানি। সব মেয়েমানুষেই বোধ হয় টের পায় তারের

কেউ ভালোবাসে কি না। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটা মিথ্যা, দুনিয়ায় কারুর জন্য কারুর আট্‌কে থাকে না।"

ভাঙ্গা গলায় সুপ্রিয় বল্লে,"তুমি এমন শক্ত শক্ত কথা আমায় শোনাতে পার, তা না শুন্‌লে আমার বিশ্বাস হতনা"।

সুপ্রিয়র হাতখানা হাতে টেনে লুসি বলে, "তোমায় শক্ত কথা ত' বলিনি, একটা সত্য কথা বলেচি। আর একটা সত্য কথা শুন্‌বে? আমিও তোমায় ভালোবেসেচি। এত ভালোবেসেচি যে মনে হয়—অবশ্য সত্যি কি আর তাই—মনে হয় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কেউ বুঝি কাউকে এত ভালোবাসে নি। তবু আমি তোমাকে পাব না।"

রহস্যময়ী এ নারীর এ অদ্ভুত সহজ স্বীকারোক্তিতে সুপ্রিয় আশ্চর্য্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই একটা মত্ত আনন্দে ওর অন্তর ছেয়ে ফেল্লে। কেবল মনে হতে লাগল "আমায় এ ভালোবেসেচে, আমায় এ ভালোবেসেচে"।

কিছুক্ষণ সুপ্রিয় স্তব্ধ হয়ে রৈল। কিন্তু যার বুকে আগ্নেয়-গিরি জ্বলচে অম্‌নি সংযম তার কতক্ষণ থাকে? দু'হাতে সবলে লুসিকে হঠাৎ বুকে টেনে নিয়ে ওর কাণের কাছে মুখ নিয়ে সে বল্‌তে লাগ্‌ল,—"কেন পাবে না? কেন পাবে না? আমি সর্ব্বস্ব-রিক্ত হয়ে সব দিয়ে দেব।"

কিছুক্ষণ ওর বুকের ওপর এলিয়ে থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে লুসি বলে, "সব দিয়ে দিলেই কি আমি নিতে

পারি, নেবারও একটা অধিকার থাকা চাই। আমার তো তা নেই।”

সুপ্রিয় চেঁচিয়ে বলে “আছে, খুব আছে, যার জন্য নেই বলছ, সে তোমার মত মূল্য কোনোদিন আমায় দেয় নি দেবেও না।” “তারপর লুসির হাত দু'খানি ঠোটে ছুইয়ে বলে “আমায় তুমিও শুকিয়ে মেরো না লুসি।”

রুদ্ধ রোদনের আবেগে লুসির ঠোঁট দু'খানি থর থর করে কাঁপতে থাকে। সেই কম্পমান অধর সুপ্রিয় চুমোয় চুমোয় ছেয়ে দেয়।

*　　*　　*　　*

তার পর দিন থেকে সুপ্রিয় কত প্ল্যান করে, কি করে ওরা সংসার পাতবে। সুপ্রিয় বলে, বে' ওদের করা যখন মুস্কিল ; করবে না, এমনি থাকবে স্ত্রী-পুরুষে। লুসি মিষ্টি হেসে বলে, “আমার ভালোমন্দ কোন জ্ঞান আর নেই। তুমি খুসী হলেই আমি সুখী।” সুপ্রিয় ওর মুখখানি টেনে ঘাড়ে চুমো দেয়। তার পর সামনের সোমবার দিন পিসিমাকে কাশী পাঠাবার বন্দোবস্ত করে।

হঠাৎ রবিবার ভোরে লুসির খোঁজ পাওয়া যায় না। তার বিছানার ওপার এক টুকরা কাগজ রয়েছে তাতে লেখা, “আমি ভারতবর্ষের বাইরে একটা হাসপাতালে চাক্‌রী নিয়ে যাচ্ছি, আমায় খুঁজো না। আমার জন্য তুমি সম্মান খোয়াতে, সে

তোমায় ভালোবেসে আমি সইব কি করে? দু'দিন পরে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সমাজ এরা সব যখন আমায় উপলক্ষ্য করে তোমায় ছাড়ত, তখন আমায় না জানি তুমি কি চোখে দেখবে কল্পনা করে আমি তোমার বাহু-বন্ধনের মধ্যে থেকেও এ-দু'দিন মাঝে মাঝে শিউরে উঠেচি। এখন পালাচ্চি, তবু আমার জন্য একটু শ্রদ্ধা, একটু স্নেহ চিরদিন তোমার অন্তরে তোলা থাকবে। সেই আমার পরম লাভ।—তোমারই লুসি।"

সুপ্রিয় সেই বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ……ওর ছুটির আরো দিন পনের বাকী ছিল; কিন্তু পরের দিন কলেজে ইস্তাফা পত্র পাঠিয়ে দেয়।

   

দুই মাস পরে কাণপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সুপ্রিয়র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়। লোকে বলাবলি করতে থাকে "গভর্ণমেণ্টের রকমই ঐ—যত শালা সব গাধা। আর রাজ্যে লোক পেলে না, জেলে পূরলে সুপ্রিয়কে, সে জানত কবিতা লিখ্‌তে আর বৌএর সঙ্গে প্রেম করতে।" আধবুড়ো-বয়সে যেচে পশ্চিমের এক মেয়ে বে' করেচে বলে তার রোম্যান্সের গল্প পল্লবিত হয়ে বাংলাদেশের বন্ধু মহলে রটে গিয়েছিল।

কমলের মা সুপ্রিয়র কারাদণ্ডের কথা শুনে দাঁতে ঠোঁট চেপে বলেন "বাঁদর!" তারপর চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকান।

মেয়ে ঠোঁট উল্‌টিয়ে ফিক্‌ করে হাসে। হেসে কিন্তু বেশীক্ষণ মা'র সুমুখে থাকে না, তক্ষুণি অন্য ঘরে চলে যায়।

কমলের মনে পড়ে সুপ্রিয়ের শেষ পত্রে তার রুদ্ধ অভিমান; লিখেছিল, "ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে গেল, তুমি দিলে হলাহল!" কিন্তু কমল তো সুপ্রিয়কে ভালোই বেসেছিল, কিন্তু তা সে ব্যক্ত করতে পারত না। স্বীয় ইচ্ছার অভিব্যক্তি জিনিষটাকে যে আশৈশব তার পিষে মারা হয়েচে! কমলের চোখে জল আসে, কেন সুপ্রিয় তাকে বুঝলে না!

মা মেয়ের খোঁজে এ ঘরে আসেন; মনে দুরু দুরু ভয়; ঠোঁট উল্টে তো মেয়ে হাস্‌লে, কিন্তু মনের ভাব কমল লুকোয়নিত? কমলের মা আজকাল যেন আর কমলের ছেলে-বেলার মতো ওর মুখের রেখাটি দেখে মনের ভাব বলে দিতে পারেন না। কেমন সন্দেহ আসে!

এঘরে এসে দেখেন কমল একটা মাসিকের পাতা ওল্টাচ্চে। কেন যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কমল কিন্তু তাঁর মুখের পানে চেয়ে অম্‌নি আর একবার হাস্‌লে।

একদিন হঠাৎ মার চোখে পড়ে, কমল দোতালার জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে তার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি কোন্ সুদূরের পানে পাঠিয়ে নিথর নিস্তব্ধ বসে আছে। আঁচল তার লুটোচ্চে মাটিতে। মাথার ত্রস্ত চুলের মধ্যরেখার প্রান্তে সিঁদূরের বিন্দুটা

অস্তগামী সূর্য্যের লাল আলোয় ঝলক দিচ্চে। বুকটা তাঁর হুহু করে উঠ্‌ল। পেছন দিয়ে গিয়ে ডাকলেন "মা কম্‌লি"—

তড়বড় করে ফিরে চেয়ে কমল হাসিমুখে জবাব দিলে "জান্‌চ মা, আমি ভাবছিলাম ঐ সন্ধ্যার আকাশের মতো গৈরিক রংয়ের শাড়ী একখানা আমি কিনব! বেশ রংটি হয়েচে, না মা ?"

এম্‌নি করে মাকে ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু মা কারো চিরদিন থাকে না। এক হেমন্তের গোধূলিতে তিনি মারা যান। কমল কেঁদেকেটে দুদিন পরে একটু সাম্‌লে উঠে একটা হাইস্কুলে মাষ্টারী নেয়। দিন গড়িয়ে চলে, একটা ঠিক আর একটার মত —বৈচিত্র্যহীন।

নিজের নির্জ্জন ঘরে একটা আসির সামনে কমলা যখন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করে, ওর নজরে পড়ে নিজের অনিন্দ্য সুন্দর মুখ, লীলায়িত বাহু, কৃষ্ণচূড় পুষ্ট বক্ষঃস্থল, ক্ষীণ কটিদেশ, ফিন্‌ফিনে সেমিজের নীচে সুগঠিত উরু, পাৎলা রাঙা ছোট্ট দু'খানি পা, এমন কি চোখে পড়ে ব্লাউসটা খুলে ফেলবার সময় শুভ্রসুন্দর দুই বাহুর নীচে সুকোমল স্বল্প কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওর দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। বৃথা, বৃথাই গেল এ জীবন, এ যৌবন। সেই কালো বেঁটে স্বপ্নজড়িত-দৃষ্টি কয়েদী মানুষটা তার এই সম্পদের মর্য্যাদা একদিন দিতে চেয়েছিল। তারপর দশ বছর কেটে গেল, কত মানুষ তার

দুয়ারে আনাগোনা কল্লে, কিন্তু তেমন চাউনি আর কেই চাইলে না। আজ কমল তার এ দুর্বহ পসরা রাখবে কোথায় ?

হঠাৎ কমলের মনে হয়, "মা আমার জন্ম দিয়েছিলেন, সে জন্ম তো আমি চাই নি! আর জন্ম দিয়েছিলেন বলেই নিজের অন্ধ স্নেহ আর আত্মাভিমানের যূপকাষ্ঠে আমাকে বলি দেবার অধিকার তাঁকে কে দিয়েছিল ?"

ওর চোখের কোণায় অজানিত অশ্রুবিন্দু জমে ওঠে!

কিন্তু তবু দিন কাটে। একটা ঠিক আর একটার মত— একটানা, বৈচিত্র্যহীন।

লকেটের কথা।

(১)

ফরমায়েস দিয়ে ছোকরা আমায় রামধন পোদ্দারের দোকান থেকে গড়িয়ে নিলে। ছিপ্ছিপে ছেলেটি, শ্যামবর্ণ, অঙ্গারের মতো কালো কোঁকড়ানো চুলের মাঝখানে সিঁথি করা, চোখের কোণায় একটি সুমধুর স্নিগ্ধতার প্রক্ষেপ, একটি শান্ত লাবণ্য ওর সারাদেহ ঘিরে' আছে!

১৭৩ নং হরিরাম বসাকের লেনের তেতালার ছাদে গিয়ে ও আমায় আধময়লা আধছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবীটার পকেট থেকে

বা'র করে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ের গলার হারের সঙ্গে ক্লিপটা দিয়ে এঁটে দিলে। ও যখন আমায় হারটার সঙ্গে গেঁথে দিচ্ছিল ভোরের হাওয়ায় বেণুবনের মত ওর সরু আঙ্গুলগুলি কাঁপছিল, ওর বুকের তাণ্ডব নৃত্যের সাড়া আমি সেই কাঁপুনির মধ্যে পাচ্ছিলুম।

মেয়েটি বল্লে, "তুমি কেন ফের এ খরচ করতে গেলে, তোমার চাইতে তোমার উপহারের দাম আমার কাছে কি বেশী, অরুণ?"

ছেলেটি জবাব দিলে, "তা নয় অবশ্যি আশা করি। তবু জানো কি, রেণু, ইচ্ছে হোলো আমার একটা স্মৃতি-চিহ্ন তোমার কাছে থাকুক। কত দিনে তোমায় পাই তা তো বলা যায় না। চাকরী বাকরীর যে বাজার,—কদ্দিনে একটা জোটে কে জানে! রোজগার না করে' তোমায় বে' করে' কষ্ট দিতে চাই নে।"

মেয়েটি কৃত্রিম রাগ করে' বল্লে, "তোমার কাছে গেলে আমি কষ্ট পাব এই বুঝি তোমার বিশ্বাস?" তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা কর্লে, "ভালো কথা, তোমার M. A'র ফল বেরুল?"—

"পরশু বেরুবে।"

(২)

মাস ছ'য়েক যায়। এক ব্যারিষ্টারের বাড়ীতে মস্ত পার্টি। রেণুর সেখানে নেমন্তন্ন। হঠাৎ বিজলী আলোয় উজ্জ্বল ড্রয়িংরুম ছেড়ে নির্জ্জন বারান্দায় এসে রেণু আমায় বুক থেকে খুলে আঁচলে বাঁধলে। ভারী রাগ হতে লাগল খস্‌খসে শাড়ীটার

মধ্যে বাঁধা পড়ে। কেমন উষ্ণ কোমল সুগন্ধি জায়গাটিতে নির্বাধ আনন্দে দুলে দুলে দিন কাটাচ্ছিলুম! কিন্তু আমার এ ভাগ্যবিবর্ত্তনের মানে বুঝ্‌লুম একটু পরেই।

রেণু কাম্‌রার মধ্যে ফিরে গৃহকর্ত্তার বড় ছেলে সুনীলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রেণুর স্বর্ণগৌর মুখখানি তখন উত্তেজনার রক্তঝলকে রঙিয়ে উঠেছে। চক্ষে পরাজিতা সিংহিণীর করুণ কৃপা-ভিখারী দৃষ্টি! সুনীলের অগ্নিশিখার মতো রং; অ্যাপোলোর মত সুঠাম দেহ, আই-সি-এস পাশকরে' সবে বিলেত থেকে ফিরেচে। রেণুকে দেখেই সহাস্যে সুনীল হাত বাড়িয়ে বল্লে,—"এই যে মিস্ রায়—আপনাকে সেই গানটা আজ শোনাতেই হবে,—

"সুন্দর মরি মরি—"

অরুণও সে পার্টিতে এসেচে। তার আদর সেখানে সুগায়ক হিসাবে। রেণুর পানে চেয়ে ওর বুক ব্যথায় ভরে' আসে। ও গায় "দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।" ফার্ষ্ট ক্লাস M. A পাশ করেও ও এখনো চাকরী পায় নি।

বাড়ী ফেরবার মুখে ঘরের কোণায় রেণুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে অরুণ মৌন প্রশ্ন নিয়ে ওর গলায় হারটার পানে চায়! সে দৃষ্টি চোখে পড়তেই রেণু আম্‌তা আম্‌তা করে অনাবশ্যক কৈফিয়ৎ দেয়, "জান্‌চ অরুণ, সেই লকেটটার ক্লিপটা ভেঙ্গে গেল কাল, তাই সেটা বাক্সে তুলে রেখে দিয়েচি।"

অরুণ নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।···আমি আঁচলের গেরোয় বিষম চটে যাই—কি মিথ্যাবাদিনী!

(৩)

তারপর একদিন রেণুর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, সে দিন সুনীল ক্রোড়পতি বিলাস মিত্তিরের অপ্সরাবিনিন্দিতা একমাত্র কন্যাটিকে বিয়ে করে' বাড়ী ফেরে। তার মাস দু'য়েক পরে হাতবাক্সের অন্ধকার কুঠ্‌রী থেকে মুক্তি পেয়ে ফের রেণুর বুকে আসন পাতবার সৌভাগ্য হ'ল। দেখি, রেণুর চোখের কোণে কালি পড়েচে; দৃষ্টিতে তার সেই হীরের দ্যুতির মতো ঠিক্‌রে পড়া প্রভা আর নেই। তার পরিবর্ত্তে সেখানে পড়েচে শ্রান্তি আর অনুচ্ছল প্রশান্তির বিমিশ্র ছায়া। আমার কিন্তু ওর এই চাউনিটি বড় মধুর লাগল।

এই দু'মাস অরুণের দেখা নেই। সে সেই পার্টির পরদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেছ্‌ল। একদিন হঠাৎ এসে সে রেণুকে বলে, "আমি পাটনায় একটা দেড় শো টাকার চাক্‌রী পেয়েছি, রেণু।" বল্‌তে এখন আর ওর সাহস হয় না—"তুমি এসো।" একটু থেমে বলে বড় রোগা হয়ে গেছ তো!"

ক্লান্ত হাসি হেসে রেণু বলে "কুচ্ছিতও হয়ে গেছি, না?"

অরুণের বুক ব্যথায় ভরে' ওঠে, সে সুনীলের বিয়ের কথা শুনেছিল। বলে, "না—বরঞ্চ তোমায় আরো ভালোই দেখাচ্চে। কিন্তু কেন এ কথা মনে হচ্চে জানি নে।"

রেণু শুধু নিঃশব্দে মৃদু হাসে। একটু পরে বলে,—"তোমার লকেটটা ফের পরেছি।" ব'লে, তর্জ্জনী আর মধ্যমা দিয়ে আমায় তুলে ধরে।

রেণু মাটির দিকে চেয়ে আছে, আমি ওর কম্পমান বক্ষের ওপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম ও চোখের জল লুকোবার জন্যই অম্‌নি চেয়ে আছে।

রেণু ফের বলে, "এটা তুমি ফেরত নিয়ে নাও। আমি আর এর ভার ব'য়ে বেড়াতে পারি না।"

অরুণ ধরা গলায় শুধোয়, "কেন" ?

টপ্ টপ্ দু' ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু রেণুর গাল বয়ে মাটিতে ঝরে' পড়ে। ধরা পড়ে গিয়ে এবার সজল আঁখি অরুণের পানে তুলে' অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলে,—

"কেন তা তুমি কি জান না ? আমি আর তোমার এ পবিত্র স্মৃতি বইবার যোগ্য নই, তা তোমার কাছে ধরা না পড়েচে নয়।"

অরুণের বলিষ্ঠ পুরুষ-চিত্ত বেদনায় বিমথিত হয়ে ওঠে; দু'পা এগিয়ে রেণুর হাত দুটি ধরে' বলে, "হয় তো জানি, রেণু, তোমার ব্যথা কোথায়, কিন্তু আমার অযোগ্য তুমি কোন দিনই হবে না। তোমার অতীত অতীতেই ডুবে যাক্। তা খুঁচিয়ে ঘা করে কি হবে ?"

রেণু ফুপিয়ে কেঁদে অরুণের কাঁধে মাথা রাখে। অরুণ পরমস্নেহে সন্তর্পণে প্রিয়াকে বাহুবন্ধনে বাঁধে। আমি দু'জনার

বক্ষোমাঝে বন্দী হয়ে শুনি "টিপ্ টিপ্ টিপ্" ওদের বুকের স্পন্দন সমানে দ্রুত তাল রেখে চলেচে।

ভগ্ন নীড়।

বালিগঞ্জ। ধবধবে সাদা তেতলা বাড়ীটার পাশে জীর্ণ একতলা বাড়ীখানি যেন চাঁদের কোলে কলঙ্ক।

বৈকাল ছয়টায় অফিস-ফেরত আধময়লা-জামা-কাপড়-পরা একটি বাবু ছোট্ট বাড়ীখানির আকাঠার দরোজায় সাদা কাপড়ের তালি লাগানো ছাতার বাঁটটা দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া ডাকিলেন, "দরজা খোল—বাবা সন্তু—"

একটু পরে ডুমড়াইয়া-যাওয়া জোড় কপাট আল্গা করিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে কহিল, "আজ যেন একটু সকালে এলে?" ঘরে ঢুকিয়া বাবুটি ছাতিটা এক কোণায় রাখিয়া কামিজের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "নাঃ সকালে বিশেষ আর কি"—

একটী শুক্নো হাসিয়া—"চৌরঙ্গীর মোড় পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ জুতার হিলটা একদম্ খসে গেল। আশ-পাশে একটা মুচি দেখলুম না যে গোটাকয়েক কাঁটা ঠুকে নেবো, কাজেই "বাস্" এ আস্তে হোলো—"

"ও, তাই ? তা বেশ ক'রেছো।"

"বেশ তো করেছি—কিন্তু ছয়টা পয়সাই নিয়ে গিয়েছিলুম ভ্যারাইটি ষ্টোরস্ থেকে সাতুর জন্য একখানা এক্সারসাইজ বুক কিনে আনবো বলে—তা আর হোলো না।"

"তা কাল না হয় কিনে দিও—ও কি—ফের চৌকীতে ধপাস করে বসলে কেন ? হাত পা ধোও—দুটী কিছু খাও—তার পরে" – মূচকি হাসিয়া—"ভালো ছেলেটির মতন বারান্দায় মোড়াখানি পেতে আমার কাছে বোস। আমি কুটনো কুটছি—ফেলে তোমায় দরজা খুলে দিতে এলাম।"

অবসাদগ্রস্ত দেহটাকে যেন অতি কষ্টে টানিয়া তুলিয়া মারক্যানটাইল ব্যাঙ্কের ৪৯৮৶ মাইনার কেরাণী লক্ষ্মীকান্ত বোস হাত পা ধুইতে গেল।

একটু পরে আধ-ভাঙ্গা মোড়াটার উপরে দুটি আদা নুন মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে লক্ষ্মীকান্ত বঁটির উপরে পত্নীর ফর্সা সরু আঙ্গুলগুলির খেলা দেখিতেছিল।

হঠাৎ একবার পত্নী কমলা মুখ তুলিয়া দেখিল স্বামী তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। সে মৃদু হাসিয়া ফের কুটনার পানে চাহিয়া কহিল "কি ভাবচ ?"

দশ বছর আগে যখন তাহার বাপ বাঁচিয়া ছিলেন—সে বি-এ পড়িত,—তখন হয় ত লক্ষ্মীকান্ত উত্তর দিত—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।" তখন

সে রাত জাগিয়া বৌকে রবিঠাকুর, সত্যেন দত্তের কবিতা শুনাইয়াছে,—নিজেও প্রেমের কবিতা লিখিয়াছে,—এবং তাহার এক আধটা যে দু'একখানা মাসিকে ছাপা হয় নাই এখনও নহে। কিন্তু সেদিন গিয়াছে।

পত্নীর প্রশ্নে লক্ষ্মীকান্ত উত্তর দিল "ভাবচি, আমার নামটা এক দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে কি সত্যি, আর এক দিক দিয়ে কি প্রচণ্ড পরিহাস বলে মনে হয়! লক্ষ্মী-ও লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়ে, কি বল?"

স্বামীর পরিহাস-তরল কথার মধ্যেও বেদনার ধ্বনির একটু আঁচ পাইয়া—"যাঃ ও" —বলিয়া কমলা স্বামীর পানে একবার চোখ পাতিয়া দৃষ্টি ফিরাইল। সে চাহনি পারিলে প্রিয়তমের সমস্ত বেদনা মুছিয়া লইত।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুক ঠেলিয়া উঠিতেছিল। পাছে কমলার কানে যাইয়া তাহাকে ব্যথিত করে ভয়ে লক্ষ্মীকান্ত তাহা চাপিয়া শুধু বলিল "হুঁ"—

পাঁচ মিনিট উভয়ে নীরব। কর্ম্মনিরত হাতে কমলার চারগাছি মাত্র রেশমী চুড়ি টুং টাং বাজিতেছিল।

লক্ষ্মীকান্ত বলি বলি করিয়াও স্ত্রীকে একটা দুঃসংবাদ দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। আজ বাড়ীওয়ালার ম্যানেজার বলিয়াছেন, তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়িয়াছে, তাহা আগামী মাসে চুকাইয়া

না দিলে তাঁহারা উঠিয়া যাইবার নোটীশ দিবেন। পাশের বড় বাড়ীখানাই বাড়ীওয়ালার।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীকান্ত নিম্নকণ্ঠে ডাকিল,—"শুন্‌চ—"

কমলা একটু অন্যমনস্ক ছিল, এমন সময় ঘর্ঘর শব্দে একখানা মোটর বাস্ বাড়ী কাঁপাইয়া গেল। দূরে একটা ফিরিওয়ালা হাঁকিল—"ব-রও-ফ।"

মুখ তুলিয়া কমলা বলিল "এই ব-রও-ফ ডাকটা কানে এত মিষ্টি শোনায় যে কি ব'লব, যেন সেই ডাক ঘরের দৈ'এর ডাক! ঐ শোনো আবার ডাক্‌চে! লোকটার আওয়াজটিও বেশ!"

স্ত্রীর রঙীন কল্পনার এ মধুর মুহূর্ত্তটুকুকে চূরমার করিয়া দিতে লক্ষ্মীকান্তের দুঃখ হইল। সে যে কথা বলার উপক্রমণিকা করিতেছিল তাহা তখনই আর তুলিল না।

কুটনা শেষ হইলে বঁটি কাত করিয়া কমলা আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইল। লক্ষ্মীকান্তের মাথায় কেমন করিয়া যেন মাকড়সার জালের একটা ছিন্ন অংশ লাগিয়াছিল, সোহাগস্পর্শে সে সেটা ফেলিয়া দিয়া চুলে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে কহিল "তোমার চুল যে সিকিপ্রায় সাদা হ'তে চল্ল—বুড়ো হতে চল্লে!"

মৃদু-হাস্যমণ্ডিত পত্নীর মুখের পানে চোখ তুলিয়া লক্ষ্মীকান্ত কহিল "চুল পাকার আর দোষ কি কমল? জীন ভ্যালজীনের

সেই গল্প পড়ে শুনিয়েছিলাম মনে আছে?—একরাতে তার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল।”

“তাই বলে তোমার তা হতে গেল কেন?…দেখ্‌ছো কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে? এখান থেকে মনে হচ্চে যেন দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ওটা ধরা যায়।” নীচুকার দেয়ালের উপর দিয়া শুক্লাত্রয়োদশীর চাঁদ উঁকি মারিতেছিল। দিনের ম্লান আলো তখনও রহিয়াছে বলিয়া চাঁদের রূপালী আলোর বান তখনও ডাকে নাই।

তাহাকে সহসা অন্য কথা পাড়িতে দেখিয়া লক্ষ্মীকান্ত বুঝিল কমলা তাহাকে এখন দুঃখের কথা ভাবিতে দিতে রাজী নয়—নইলে চাঁদের সৌন্দর্য্য আজকাল আর কমলারও মনে ছায়াপাত করিবার ফুরসুৎ পায় কি?

কিছু না বলিয়া সে নিবিড় স্নেহে পত্নীকে বক্ষে আকর্ষণ করিল। তাহার শিথিল দেহ স্বামীর বক্ষে লতাইয়া পড়িতেই দরোজায় আওয়াজ শোনা গেল “দরোজা খোল—”

“খোকা আস্‌চে” বলিয়া কমলা নিজের দেহ বাহুপাশ মুক্ত করিয়া লইয়া দরোজা খুলিয়া দিতেই সাত বছরের ছেলে সত্যেন্দ্র ওরফে সাতু একটা রবারের বল লুফিতে লুফিতে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল “কৈ বাবা এসেচে, আমার এক্সারসাইজ বুক এনেছে?”

সস্নেহে ছেলের গাল টিপিয়া দিয়া কমলা বলিল—“বাব্বাঃ,

বাবু যেন একেবারে খাঁড়া হাতে ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন, বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতে পরোয়ানা জারী করে কৈফিয়ৎ চাই।"

সাতু বাবু সে কথায় কান না দিয়া ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া বাপকে দেখিয়া কহিল—"কৈ আমার খাতা ?"

"ও যাঃ আজ যে ভুলে গেছি বাবা"—

"বা—রে, আজই খাতা নিয়ে যাইনি বলে, আমায় বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে রেখেচে, কাল না নিয়ে গেলে স্যার ফাইন করবে বলেচে যে—"

শেষ কয়েকটি মুড়ি সমেত ছোট ডালাটি মাটিতে রাখিয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল "আচ্ছা, চল বাবা, ঐ মোড়ের দোকান থেকে তোমার খাতা কিনে দি,—একটা পয়সা হয়ত এখানে বেশী নেবে, তা নিক্।"

পিতা পুত্রে হাত ধরাধরি করিয়া চটি পায়ে কাপড়ের খুঁট গায়েই বাহির হইল।

কথাটা তখনকার মতো চাপা থাকিল বটে কিন্তু রাতে শুইয়া লক্ষ্মীকান্ত যখন পত্নীকে ধীরে ধীরে শুনাইল যে বাড়ীওয়ালা বলিয়াছেন এ মাসে বাড়ী ভাড়া শোধ করিতে না পারিলে বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তখন কমলা কথা খুঁজিয়া না পাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু পত্নী চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেও লক্ষ্মীকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল কমলা রাত দুইটা পর্য্যন্ত ঘুমায় নাই। খোলা জানালা দিয়া

কিন্তু চাঁদের আলো তখনও বিছানার চাদরে লুটাইতেছিল। লক্ষ্মীকান্ত অনেকক্ষণ পত্নীর বোজা চোখের দিকে চাহিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে পত্নীকে বক্ষে জড়াইল, যেন সে সোহাগ দিয়া ঐ আঘাতের শোধ দিতে চায়। কমলা যদি মনে করিয়া থাকে তাহার [নিদ্রার ভানকে লক্ষ্মীকান্ত নিদ্রা বলিয়া সত্যই ঠাওরাইয়াছে,—তো তাই ভাবিয়াই এ আলোচনা হইতে নিবৃত্ত থাকুক। আর আলোচনা করিয়াই বা ফল কি? তবু কমলাকে সব কথা না বলিলেই বা চলে কি করিয়া?

(খ)

আজ দশ দিন হইল সাতুর ব্যামো। প্রথম দু তিন দিন সামান্য পেটের অসুখ করিয়াছিল। তারপর সেদিন স্কুলের কোন সহপাঠী বন্ধুর চীনাবাদামে ভাগ বসাইবার ফলে আমাশায় দেখা দিল। যেদিন সে শয্যা লইল, কমলা স্বামীকে বলিল—"ওগো, বিশু ডাক্তারের কাছ থেকে খোকার কথা বলে একটু ওষুধ নিয়ে এসো না?"

"ও সামান্য পেটের অসুখ অমনি সেরে যাবে। তিন ঘণ্টা পর পর এক ডোজ মার্কুরিয়াস দিও তো আজ। কথায় কথায় ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া কি আমাদের পোষায়?" বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত অফিসে চলিয়া গেল।

কিন্তু পোড়া ব্যামো ঘরের অযুদে কমিল না। বিশু ডাক্তার

দুই চার বার বাড়ীতে আসিয়া দেখিয়াও গেল; কিন্তু দশ দিনেই সাতুর শরীর আধখানি হইয়া গেল।

লক্ষীকান্ত নয়টায় অফিসে চলিয়া যায়—কমলা পুত্রের রুগ্ন মুখের পানে চাহিয়া একা দিন কাটায়। রুগ্ন শিশু মুহূর্ত্তের তরে উঠিতে দেয় না,—মা চৌকি ছাড়িয়া নড়িলে কাঁদিয়া খুন হয়।

সেদিন দুপুর বেলা সাতুর একটু তন্দ্রার মতো আসিয়াছে। পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কমলার মনশ্চক্ষের সামনে সাতুর সাত বছরের ছোট্ট জীবনটির কত কথা ছায়াচিত্রের মতো ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই তো সেদিন সাতু এতটুকুনটি ছিল। শেফালি-স্তবকের মতো নরম ছিল তার দেহ; একান্ত নির্ভরে মায়ের বক্ষের উপর লুটাইয়া চুক্ চুক্ করিরা দুধ খাইত। কত না বর্ষা শীতের রাত্রি সে পুত্রের মল-মূত্র-সিক্ত বিছানায় রাণীর মতো সুখে কাটাইয়াছে। তার পর খোকা বড় হইয়া উঠিল—স্কুল হইতে কার সঙ্গে একদিন খোকা মারামারি করিয়া কপাল কাটিয়া ফিরিয়াছিল, লক্ষীকান্ত তাহার উপর তাহাকে বকুনি দিয়াছিল। মনে পড়িল স্বামীকে মুখে কিছু না বলিলেও স্বামীর উপর তাহার সেদিন রাগ হইয়াছিল। এক দিন খোকা কমলার অসুখের সময় স্কুল পলাইয়া মায়ের জন্য পাড়ার কার গাছ হইতে পেয়ারা চুরি করিয়া আনিয়াছিল; কেন না, কমলা জ্বরের মুখে পেয়ারা চিবাইতে ভালোবাসিত। মা সেজন্য সাতুকে মৃদু ভৎর্সনা

করিয়াছিলেন। আরো খুঁটিনাটি কত কথা। সাতু ও-মাসে একদিন পিঠা খাইতে চাহিয়াছিল; পয়সার অনটনে এ মাসেও তাহা খাওয়ান হয় নাই;—তারপর সে অসুখে পড়িল। বাছা তাহার আরো কতদিন ভুগিবে কে জানে? তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—তলপেটে তাহার সেক দেওয়া হয় নাই বলিয়া ডাক্তার কাল রাগ করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি সে একটু আগুন করিয়া আনিল। কিন্তু সেক দিতে যাইয়া দুইখানি ফ্ল্যানেলের টুকরা পুড়াইয়া ফেলিল, হাতে বার দুই ছ্যাঁকা লাগিল, বেশী গরম লাগায় সাতু মাঝে মাঝে চ্যাঁচাইয়া উঠিতে লাগিল। কমলা ঘামিয়া উঠিল—নেহাৎ অকর্ম্মণ্য সে। তাহার রাগ হইতেছিল হাই স্কুলের থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া কী তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে? সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কাহাকে বলে না জানিয়া একটু এ সব কাজগুলি শিখিলে কাজে লাগিত।

পাঁচটা নাগাত খোকা সত্যই একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তখন সে ঘর ঝাঁট দিয়া জঞ্জালগুলি বাইরে ফেলিয়া দিয়া মিনিটখানেকের জন্য জানালার গরাদে ধরিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রাস্তার পানে চাহিল—হঠাৎ তাহার মনে হইল ঐ যে টেলিফোন তারের উপর খঞ্জনটা পুচ্ছ দুলাইয়া নাচিতেছে, ঐ যে পাঠশালার পোড়ো মেয়েটা বেণী দুলাইয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছে, ঐ যে কিছু দূরে একদল খোট্টা হৈ চৈ করিতে করিতে চলিয়াছে—ইহারা

যেন সব কলের পুতুল—যা কিছু এরা করে সবই যেন নিরর্থক। দুনিয়ার কোনো কিছু কাজের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই ;—রুগ্ন শিশুর শয্যাপার্শ্বে তাহার যন্ত্রণার মূক সাক্ষী মায়ের চক্ষে আনন্দ-চঞ্চল বিশ্বের বিচিত্র বিবর্ত্তন সম্পূর্ণ অর্থহীন।—অথচ অনতিদূরে অতীতে ধরণীর জীবন-চাঞ্চল্যের অনুভূতি তাহার তরুণ চিত্তকে কতদিন না তন্ময় উন্মনা করিয়া দিয়াছে!

ধূলিকুণ্ডলি উড়াইয়া একখানা দামী হাওয়াগাড়ী চলিয়া গেল। তাহার জানালা হইতে একখানি কচি মুখ উৎসুক নেত্রে কমলার পানে চকিতে চাহিয়া মিলাইল।—মেয়েটি পাশের বড় বাড়ীর বৌ।—প্রায়ই বৈকালে স্বামীর সহিত গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হয়, আর অমনি করিয়া কমলার চোখে চোখ পড়িলে চাহিয়া যায়; যেন ছুটি কথা বলিতে চায়, কমলার সঙ্গে ওর যেন প্রাণের টান আছে।

লক্ষ্মীকান্ত বাড়ী আসিতেই সেদিন কমলা কাঁদিয়া বলিল, "তুমি একবার ভালো একজন ডাক্তার ডেকে সাতুকে দেখাও।"

ভালো ডাক্তার মানে ষোল টাকা ভিজিট—কোথায় মিলিবে? এমন একখানা জিনিষও ঘরে নাই যাহা বিকাইয়া ও-কয়টি টাকা মিলিতে পারে।—অথচ স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া লক্ষ্মীকান্ত ভয় পাইয়া গেল।—একটা সর্ব্বস্বরিক্ততার ছাপ যেন তার মুখে এখনই করাল ছায়া ফেলিয়াছে।—সাতু তার মায়ের কী ধন তাহা তো তাহার না-জানা নাই!

কমলা কাঁদিয়া বলিল—"কারুর হাতে পায়ে ধরে ধার করে টাকা আন, সাতুর ব্যামো ত আর চিরকাল থাকবে না"—

মুখ কালো করিয়া লক্ষ্মীকান্ত বাহির হইয়া গেল টাকার সন্ধানে।

ডাক্তার পরদিনও কিন্তু আসিল না—রুধির কৈ? পরদিন অফিস হইতে ফিরিয়া লক্ষ্মীকান্ত দেখিল বর্ষণ-ক্ষান্ত মেঘভার-পীড়িত আকাশের মতো পত্নীর মুখ;—প্রাণের রস যেন সব নিঃশেষে নিংড়াইয়া কেহ তাহার পলে পলে শুষিয়া লইতেছে।

খোকা ডাকিল—'বাবা কাছে একটু বোসে এইখানে একটু হাত বুলিয়ে দাও,—জানো বাবা এ পাশটাতে বড় ব্যথা।"

বাপের পানে নির্নিমেষ নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে সাতু চাহিয়া রহিল। ওষ্ঠের কোণায় আকুঞ্চন-রেখা ক্ষণে ক্ষণে তাহার যন্ত্রণা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু পূর্ব্বের মতো আর বায়না ধরিয়া কাঁদিবার ক্ষমতা নাই।

হঠাৎ সাতু শ্রান্ত স্বরে টানিয়া টানিয়া বলিল, "তোমার কোলে উঠতে ইচ্ছে হচ্চে বাবা, আমায় একটু কোলে নাও না।"

আস্তে পুত্রের মাথাটা কোলে তুলিয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল "তুমি তো কোলে উঠতে পারবে না বাবা, এই কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাক।" সাতু ঘাড় নাড়িল।

"মা কোথায় বাবা?

"ঐ ও ঘরে,এক্ষুনি আসবে"—মা দুটী চাল ফুটাইয়া লইতে এই অবসরে রান্নাঘরে গিয়াছিলেন। পেট তো কোনো ওজর মানিবে না।

তাড়াতাড়ি ছেলেকে ভুলাইবার জন্য লক্ষ্মীকান্ত তখনই বলিল "জানো সাতু কাল মডার্ণ ষ্টোরস্ থেকে সেই কলের রাজহাঁসটা তোমায় এনে দেবো।"

বালকের নিষ্প্রভ চক্ষু সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—"সত্যি দেবে বাবা?"—ঐ টিনের তৈরী শুভ্র রাজহংসের পিঠে চড়িয়া পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কত সকাল সন্ধ্যায় তাহার শিশুচিত্ত মেঘবরণ চুল কুচবরণ কন্যার সাত সমুদ্র নদীর পারের সাত মহলা বাড়ীতে আনাগোনা করিয়াছে!

সাতু ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করিল "তুমি বলেছিলে সেটা চাবি দিয়ে দিলে চলে,—জলে চলে না ডাঙ্গায় চলে বাবা?"

"জলেও—ডাঙ্গাতেও"—

"আকাশেও উড়তে পারে?"

"টিনের হাঁস কি আকাশে উড়তে পারে পাগলা?"

কতকটা ক্ষুব্ধ হইয়া, কতকটা এতগুলি কথা বলার শ্রান্তিতে সাতু চোখ বুজিল। কিছুক্ষণ পরে কমলা আসিতেই লক্ষ্মীকান্ত চাদরটা টানিয়া বাহির হইবার মুখে শুধু মাটির পানে চাহিয়া বলিয়া গেল,—"খোকার জন্য ডালিম আনতে যাচ্চি।" খোকা কিন্তু খাইতে চাহিয়াছিল বেদানা; কিন্তু—বেদানার সের আড়াই টাকা, ডালিমের সের পাঁচ সিকা।

রাত আটটায় বাসায় ফিরিয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল—"আমি আজ

খাবো না—আর পাশের ঘরটায় একটা মাদুর পেতে দাও—শোবো।"

"সে কি! খাবে না কেন—আর পাশের ঘরেই বা শোবে কেন?"

"আর কথা কেটো না—যা বলচি তাই করো। আমার শরীরটা বিশেষ ভাল বোধ হচ্চে না, একটু নিরিবিলি থাকতে চাই। এ ঘরে বিশেষ দরকার হয় ডেকো।"

কমলা আর উচ্চবাচ্য করিল না। স্বামীর গলার আওয়াজে বুঝিয়াছিল—করিয়াও লাভ নাই।

পরদিন অফিস হইতে ফিরিবার পথে ডাঃ সরকার—কলিকাতার সেরা ডাক্তারকে একেবারে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীকান্ত বাসায় ফিরিল।

ডাক্তার যাইবার সময় জনান্তিকে মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া গেলেন, "আপনারা রোগীকে শেষ না করে ভাল ডাক্তার ডাকবেন না, তা আর কি হবে—"

নতমুখে লক্ষ্মীকান্ত অস্ফুট স্বরে বলিল—"ভিজিটটা"—

"Thanks"—

লক্ষ্মীকান্ত তখনই বাহির হইয়া আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই কলের রাজহাঁসটী ও গোটাদুই বেদানা লইয়া আসিল। ডাকিল—"বাবা সাতু—"

খেলনা পাইয়া সাতুর বিশুষ্ক মুখে হাসির রেখা ফুটিল। কমলা দেখিতেছিল ছেলের মুখে শীর্ণ হাসি, বাপের চোখে জল।

একটু পরে কমলা শুধাইল, "কদ্দিনে খোকা সেরে উঠবে ডাক্তার বল্লে ?"

মুখ ফিরাইয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল "শীগ্‌গির"—

দিন দুই পরে আপিস হইতে ফিরিয়া লক্ষ্মীকান্ত পত্নীর কাছে শুনিল বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়াছে আগামী মাসের পয়লা তারিখ বাড়ী ছাড়িতে হইবে। সেদিন মাসের পনেরই।

দুসম্বাদটা দিয়াই হাসিমুখে কমলা পুনরায় বলিল— "খোকা অদ্দিনে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে—তা ভাবনা কি ? জানো, আজও চেয়ে একটু খাবার খেয়েচে—মলের সঙ্গেও আজ রক্তও পড়েছে খুব কম—"

অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্মীকান্ত উত্তর করিল,—"তা হবে।"

দুটি মুড়ি ও কাঁসার বাটীতে করিয়া একবাটি চা স্বামীকে দিয়া কমলা পুনশ্চ কহিল, "জানো, বাড়ীওয়ালার ছেলের বৌটি, ঐ মাঝে মাঝে যাকে মোটরে করে বেড়াতে যেতে দেখি,—তার বোধ হয় আজ ছেলে হবে—ও বাড়ীর ঝি বলে গেল—বেদনা উঠেচে।"

"ডাক্তার সরকারের 'কার' ও-বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দেখলুম বটে—"

হঠাৎ ঘুমন্ত সাতুর গলায় কেমন একটা ঘড় ঘড় শব্দ শোনা গেল। কমলা দৌড়াইয়া গিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"ওগো ছাখ, খোকা এমন কচ্ছে কেন?"

লক্ষ্মীকান্ত যাইয়া দেখিল ছেলের চক্ষে অর্থহীন ঘোলাটে নিস্পলক দৃষ্টি, আর ঠিক চামড়ার নীচের পঞ্জরাস্থি কয়খানি গলার ঘড়ঘড়ির সঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে।

"তুমি ব্যস্ত হয়ো না, একটু আগুন নিয়ে এসো, সেক দি"—

* * * *

ঘণ্টাখানেক পরে কমলা যখন কাঁদিয়া উঠিল "বাপরে আমার"—তখন পাশের রাজাবাবুর বাড়ী একটি নবাগতের অভিনন্দনসূচক হুলুধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

(গ)

খোলার ঘর। পাশ দিয়া নর্দ্দামা; তাতে পচা ইঁদুর আরসোলা আর মল মূত্রের দুর্গন্ধ। ডানদিকে তার একটা কামার দিনরাত লোহা পিটে,—বাঁয়ের বস্তিতে একপাল মেয়ে কখন ঝগড়া করে, কখন ভাব করে, সন্ধ্যায় দল বাঁধিয়া মুখে রং লেপিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া চুরুট ফোঁকে শিকারের প্রতীক্ষায়।

কমলা এখানেও তেমনি রাঁধে-বাড়ে, সংসার চালায়। লক্ষ্মীকান্ত দশটা পাঁচটা অফিস করে। সাতু বিদায় লইবার পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি একটা আক্রুর দেওয়াল যেন গড়িয়া

উঠিয়াছে। স্তব্ধ দুপুর রাতে কমলা টের পায় স্বামী নিদ্রাবিহীন চক্ষে এপাশ ওপাশ করিতেছে, কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করে না—কী-ই বা সে বলিবে ? ···কিন্তু তবু দিন কাটে।

* * * *

সাতু চলিয়া গিয়াছে বাইশ দিন হইল। অতর্কিতে তাহাই হিসাব করিতে করিতে কমলা তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইতেছিল ; এমন সময় লালপাগড়ীওয়ালা একজন কনেষ্টবল চিঠি বলিয়া হাঁকিল। কমলার বুক ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—কি সংবাদ আবার এ লইয়া আসিল কে জানে ?

চিঠি লইয়া তাড়াতাড়ি আলোর সামনে যাইয়া সে পড়িল, তাহাতে লেখা আছে—

"কল্যাণীয়াসু—

হতভাগিনি—আমি জেলে যাইতেছি। সাতুর জন্য বড় ডাক্তার ডাকিবার জন্যে অফিসের তহবিল হইতে কিছু টাকা কাহাকেও না বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম আগামী দুই মাসের মাইনা হইতে তহবিল পুরাইয়া রাখিব। অন্য কোনো উপায়ে আর সে সময়ে টাকা পাইবার ভরসা ছিল না। কিন্তু সাতুকেও রাখিতে পারিলাম না, জেলেও চলিলাম। তোমায় এতদিন এ কথা বলি নাই, তবু এ নূতন যন্ত্রণা কয়েকদিন পরে সুরু হইল। নগেন—তোমার খুড়তুত ভাইকে কাল তার করিয়া দিয়াছি—সে তোমাকে আজ আসিয়া তাহার ওখানে

লইয়া যাইবে। আজ বিচার শেষে আদালতেই এই চিঠি লিখিয়া তোমায় পাঠাইতেছি। আমি সব কথাই কোর্টে স্বীকার করিয়াছিলাম—এবং যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আমার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নাই। ছয় মাস পরে কয়েদ হইতে ভগবানের ইচ্ছায় যদি বাহির হই, তখন আর সবাই ঘৃণা করিলেও আশা করি তুমি আমায় ঘৃণা করিবে না। ইতি

তোমার হতভাগা স্বামী।”

কমলার পায়ের নীচে হইতে ধীরে ধীরে যেন মাটি সরিয়া যাইতেছিল।···এমন সময় বাহির হইতে দরোজার কড়া নড়িয়া উঠিল। কমলার খুড়তুত ভাই নগেন আসিয়া পৌছিয়াছে।

শেষ সাধ।

বিচারালয়। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চ্যাটার্জ্জী মহাশয়ের কোর্টে ছোট খাট ফৌজদারী মামলা হইতেছে। আসামী প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক প্রৌঢ়া রমণী। মুখ তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত। যে অংশটুকু দেখা যাইতেছে তাহাও রুক্ষ কুঞ্চিত কেশজালে আবৃত; তাহারই

ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র গণ্ডের কিয়দংশ ও একটি চক্ষের ত্রস্ত চকিত চাহনি দেখা দিয়া ক্ষণে মিলাইতেছে।

অভিযোগ—গারী গণিকা,—সে বিগত রাত্রে যাহাকে ঘরে বসাইয়াছিল তাহাকে এক রকম অকারণেই আঁচড়াইয়া ও কামড়াইরা রক্তারক্তি করিয়া দিয়াছে। অভিযোক্তা একটা কালো বেঁটে লোক পনের আনা এক আনা করিয়া চুল ছাঁটা, চক্ষে গিল্টির চশমা, তাহার ফ্রেমের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে। চোক্ষ দুটা গভীর কূপের জলের মতো কপাল হইতে যেন অতলে তলাইয়া গেছে। সমস্ত মুখখানি দুষ্ট ব্রণে ঢাকা,—এক একটা তার এত উঁচু যে যেন রিলিফ ম্যাপে গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ।

দর্শকমঞ্চে কয়েক জোড়া উৎসুক চক্ষু আসামীর পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিল। ফিস্ ফিস্ করিয়া একজনা আর একজনাকে হঠাৎ কহিল—"জাতে তো বেবুশ্যে তার ঢং দেখুন না মশাই—নতুন বৌটার মতো ঘোমটা টেনে দিয়েছেন!" মনে মনে হয় তো জল্পনা চলিতেছিল—হাত পা ও গাল যার এমন ধব্ ধবে সাদা ঘোমটার আড়ালে মুখখানি বোধ হয় তার মন্দ চীজ্ নয়!

মামলার লজ্জাকর কাহিনীর সবিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক। বিচারে যদিও সাব্যস্ত হইল লোকটার ব্যবহারে রমণীর ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল, তথাপি দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে

বিচারক মহাশয় রাজী নহেন,—অতএব তাহার ত্রিশ টাকা জরিমানা হইল, অন্যথা পনের দিন কারাদণ্ড।

দণ্ডাদেশ শুনিয়া দুর্ভাগিণী রমণী আর্ত্তস্বরে কাতরধ্বনি করিয়া উঠিল "দোহাই জজ বাবু—"। রমণীর জরিমানা দিবার সাধ্য ছিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কোর্টপুলিশকে ডাকিয়া কহিলেন—**"next case"** ঘাড় নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাঁচাপাকা চুলে ঢাকা মস্তকশীর্ষে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থিবদ্ধ শিখা দুলিয়া দুলিয়া তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিল। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হইলে কি হয়—নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ। ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। এসমস্ত নীতির খাতিরে শাস্তি তাঁহার হাতে অনিবার্য্য।

পুলিশ রমণীর হাত ধরিয়া টানিতেই রমণী পুনরায় আর্ত্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। পুনরায় আর এক হ্যাঁচকা টান। মুখের অবগুণ্ঠন তাহার খসিয়া পড়িল; মুখখানির গঠন চমৎকার অল্প-বিস্তর বসন্তের দাগে ঢাকা। সে মুখ যৌবনে অসুন্দর ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নজর সে দিকে পড়িতেই তিনি ত্রস্ত চোখ ফিরাইলেন,—অপাপবিদ্ধ নয়ন যদিই বা কুলটার পানে চাহিয়া কলুষিত হইয়া যায়।

(২)

রবিবার। বেলা নয়টা।

"চাট্টি ভিক্ষে পাই মা"—বলিয়া এক ভিখারিণী খিড়কি দুয়ার দিয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে কর্ত্তাগিন্নী বিশ্রাম্ভালাপে রত ছিলেন। গিন্নী খড়খড়ির ফাঁক দিয়া ভিখারিণীর দিকে একবার চাহিয়া হাঁকিলেন—"ঝি অ ঝি একমুঠো চাল্ দিয়ে দাও তো বাছা"—

ঝি উত্তর দিল না। কর্ত্তাগিন্নী ফের কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইয়াছেন; মিনিট পাঁচেক পরে সরমকুণ্ঠিত গলায় ভিক্ষারিণী প্রশ্ন করিল "ভিক্ষা তো পেনু না মা, যাবো কি ?"

গিন্নী তাহার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ঝি বুঝি বাড়ী নেই, চাকরটাও কোথায় বেরিয়েচে। যাই আমিই চাট্টী ভিক্ষা দিয়ে আসি।"

গিন্নী মাটির একটা গেলাসে করিয়া ভিখারিণীর আচলে চাল ঢালিয়া দিতেছেন, এমন সময় একটা দমকা হাওয়াতে ভেজানো জানালার একটা পাট খুলিয়া যাওয়াতে ভিখারিণী কর্ত্তার চোখে পড়িল। সেই নারী,—যাহার বিচার তিনি সেদিন নিজে করিয়াছেন। সেই রুক্ষ চুল—সেই অনিন্দ্যসুন্দর রংএর উপর উপদ্রুত জীবনের তামাটে ছোপ, সেই টানা চোখ দুটি ব্যথায় ভরা।

ম্যাজিষ্ট্রেট অভয়াচরণ জানালার কাছে সরিয়া আসিয়া গলা বড় করিয়া কহিলেন, "তোমরা কিছু দ্যাখো শোনো না,—সব সময় খিড়কী দুয়ারটা হাঁ করে খুলে রাখো, আর সুবিধে পেয়ে যত নচ্ছার মাগীর দল এসে বাড়ীতে ঢোকে।" রমণী ঘাড় ফিরাইল। অভয়াচরণের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই সে মাথার কাপড়টা টানিয়া দ্রুত পলাইল। অভয়াচরণ বকিয়া যাইতে লাগিলেন "যত সব **dirty hags** ইত্যাদি ইত্যাদি"—

গিন্নী ঘরে আসিলে বলিলেন, "জানো তো না এ মাগী কি বজ্জাত। শোনো—"

শুনিয়া গিন্নী একটু চুপ থাকিয়া কহিলেন "যদি ও পাপ করেই থাকে ভগবান ওর বিচার করবেন। আমরা নিজেরাওত তাঁর চরণে কত দোষ কচ্চি রোজ। দুটি ভিক্ষা নিয়ে যায়,—যাক্ না; কেষ্টের জীব ত!"

কর্ত্তা আলবোলার নলটা মুখে তুলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন,—"না-না ওসব মেয়েমানুষ আমার বাড়ীতে ঢুক্‌তে পাবে না।" পরে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করিয়া টানিতে আরম্ভ করিয়া একবার বলিয়া উঠিলেন "ছোঃ"—অর্থাৎ "স্ত্রী-বুদ্ধি" কি সাধে শাস্ত্রে বলে।

তারপর অভয়াচরণ ঐ মেয়েটীকে ঐ রাস্তা দিয়া আরো দুই তিন দিন চলিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার কট্‌মটে চাহনিতে চোখ পড়িতেই যেন সে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া দারুণ সঙ্কোচে মুখ ফিরাইয়াছে।

গিন্নী কিন্তু ওদিকে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছিলেন। একদিন ছাতের উপর হইতে মেয়েটিকে পথে যাইতে দেখিয়া ঝিকে দিয়া তাহাকে ডাকাইয়া ভিক্ষা দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন "কর্ত্তা মাজিষ্টর মানুষ, বড্ড কড়া লোক,—লোকজনকে খাম্‌কা অমনি যা'তা' বকেন; তা তুমি কিছু মনে কোরো না বাছা, এদিক দিয়ে যেতে রবিবার ছাড়া অন্য দিন ভিক্ষা নিয়ে যেয়ো।" ইহাদের জীবনে কি লাঞ্ছনা যে সহ্য করিতে হয় তাহার সবিশেষ বিবরণ সেদিন কর্ত্তার মুখে শুনিয়া অবধি গিন্নীর স্নেহপ্রবণ নারীচিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ এই মেয়েটির কি করুণ চোখ দুটী; বয়সেও নিজের চাইতে কিছু ছোটই মনে হয়, তাই যেন ইহার জন্য কেমন একটু অহেতুক মায়া গিন্নীকে পাইয়া বসিয়াছিল।

তাহার কথার উত্তরে মেয়েটী কৃতজ্ঞতাভরা চোখদুটিতে নিঃশব্দ নিবেদন জানাইয়া সেদিন বিদায় হইয়াছিল। কিন্তু ওপথ দিয়া তাহার পর একাধিকবার যাতায়াত করিলেও সে কিন্তু আর ভিক্ষার্থ এ বাড়ীতে আসে নাই।

সেদিন শনিবার। বেলা প্রায় একটার সময় গিন্নী দোতলার বারান্দায় বসিয়া শীতের রোদ পোহাইতেছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন সেই ভিখারিণী যাইতেছে। ঝিকে দিয়া সেই দিনও ডাকিয়া পাঠাইলে সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরপদে ভিতরে আসিল।

সেদিন ভিখারিণীর সঙ্গে গিন্নীর নানা কথা হইল। অবশেষে

গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি করে চলে বাছা?" "আজকাল তো ভিক্ষা করেই চলে মা"—

"তার আগে কি করতে—?" প্রশ্ন করিয়াই গিন্নী একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন,—যদি কর্ত্তার সেদিনের কথা সত্য হয়! আইন আদালতের বিচারে গিন্নীর বড় বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার একটি ভাই যেদিন হইতে অন্তরীণ হইয়া আছে সেদিন হইতেই তিনি বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। আজও ভিখারিণীর এমন নম্র ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া সেদিনকার কাহিনী যে মিথ্যা সে বিষয়ে তার যেন প্রায় সন্দেহই ছিল না। কিন্তু যদি সে কাহিনী সত্য হয় তাহা হইলে বেচারী এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে?

ভিখারিণী কিন্তু চট্ করিয়াই জবাব দিল, "কাজ কি আর জীবনে একটা করেছি মা? দুঃখী মানুষ, কত রকম কাজই কর্‌তে হয়েচে। তবে আজ কাল কখনো ভিক্ষা ক'রে, দেহটা ভাল থাকলে কখনো বা দুই একটা ঠিকা কাজ ক'রে চল্‌ছে। তবে দেহটা প্রায়ই অপটু হয়ে পড়ে মা।"

এত বেলা পর্য্যন্ত সে খায় নাই শুনিয়া গিন্নী তাহাকে দুটি ভাত খাইয়া যাইতে বলিলেন। ভিখারিণা কিছুতেই স্বীকার করিল না, বলিল "সবে তো একটা বেজেচে, এসময় আমাদের মতো মানুষের প্রায়ই খাওয়া হয় না, মা। তাহলে আজ আসি—"

এমন সময় গিন্নীর ছোট ছেলে অজিত স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "খেতে দাও।" শনিবারের স্কুল সকালে ছুটি।

মা হাসিয়া উত্তর দিলেন "রোজ তো চারটের সময় এসে খাস্, কিন্তু শনিবার দিন একটার সময়েই কি করে ক্ষিদে পায়রে অজিত ?"

ভিখারিণী ছেলেটির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল ; জিজ্ঞাসা করিল, "এইটি বুঝি আপনার ছেলে ?"

"হ্যাঁ, এইটি আমার ছোট ছেলে বাছা, ইস্কুলে পড়ে। কিন্তু ওকি তোমার চোখে যে জল এসে পড়েচে ? তা অমনি বুঝি তোমারও একটি ছিল ?"

রমণী অস্ফুটে বলিল "হ্যাঁ"। তারপর দুই পা অগ্রসর হইতেই গিন্নী বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ! তোমায় চাট্টি চাল দিতেও ভুলে গেছি, দাঁড়াও গো।"

"আজ আর চাল নেবো না মা। ঝুলিটা বড্ড ভারী হয়ে গেছে, ঢের চাল পেয়েচি।" একটু থামিয়া পরে অজিতের পানে চাহিয়া কহিল "একটু কাছে এসো তো বাপ।"

অজিত বারান্দার একটা থাম ধরিয়া তখন পাক খাইতেছিল। ফুটফুটে আট বছরের ছেলে সে।

অজিত মায়ের মুখের পানে চাহিল। তিনি বলিলেন "যা' না।"

সে কুণ্ঠিত ভাবে রমণীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাত! ভিখারিণী অজিতের চিবুকে ধীরে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া চুম্বন করিতেই ঘরের ভিতর হইতে একটা

প্রচণ্ড হুঙ্কার শোনা গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অভয়াচরণ সহ্যাট-কোট-বুট ঝড়ের মতো বারান্দায় আসিয়া উৎকট উত্তেজনায় চেঁচাইতে লাগিলেন "দে তো রে রহমান—এই হারামজাদী বদমায়েস মাগীকে বার করে! সোয়াগ করবার বেটী আর জায়গা পেলেনা - ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকে - " গিন্নীর পানে রক্তচক্ষু হানিয়া কহিলেন "তুমিই বা কি বে-আক্কেল, এ মাগীকে এমনি করে আস্কারা দিচ্চ ?—রহমান—রহমান—"

কোর্টে মাথা ধরাতে অভয়াচরণ আজ শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গের আরদালি রহমান গাড়ী হইতে নথিপত্রের বাণ্ডিলটা বাইরের ঘরে টেবিলের উপর রাখিয়া খিড়কি দুয়ার দিয়া প্রভুর ডাকে ভিতরে ছুটিয়া আসিল।

ভিখারিণী দৃপ্তচক্ষে উন্নতফণা সাপের মতো একবার ঘাড় বাঁকাইয়া সবার পানে চাহিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন বিদ্যুৎ ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। হতভম্ব অজিত ও অপমানিতা গিন্নীর ছল ছল চোখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সে নিঃশব্দে ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

দুপুর রাতে তুমুল ঝড়। বায়ুর নিঃশ্বাসে যেন বাসুকীর সহস্র ফণার গর্জ্জন। বোঁ-ও-ও-ও—সোঁ-ও-ও-ও—হাওয়ার ঘূর্ণীপাকের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লাটিমের মতো ঘুরপাক খাইয়া মহাব্যোমে উৎক্ষিপ্ত হইল। মুহুর্মুহু কে

যেন কালো আকাশখানাকে আঁকাবাঁকা আঁচড় কাটিয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে; পরক্ষণেই ব্যোমের দীর্ণবক্ষ হইতে সহস্র কামান গর্জ্জনের মতো আর্ত্তচীৎকার ধ্বনি—কড় কড় কড়াৎ।

রাত তৃতীয় প্রহরে কালবৈশাখীর হাওয়া ধরিয়া আসিল। তখন গিন্নী ফের ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু অভয়াচরণের চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না। হঠাৎ বাতাসের করুণক্রন্দন ভেদ করিয়া একটা গোঙানির আওয়াজ যেন তাঁহার কাণে ভাসিয়া আসিল। না এ বাতাসেরই শব্দ? কিন্তু আবার স্পষ্ট ঐ যে আবার—ও—ও—ও!

অভয়াচরণ সুইচ্ টিপিয়া কান খাড়া করিলেন। ঐ যে বাহিরের বারান্দার দিক হইতে শব্দ হইতেছে। আস্তে তিনি বাইরের বারান্দায় আসিলেন। ঐ যে ওখানে গাঢ় অন্ধকারে সাদা কি একটা স্তূপ পড়িয়া আছে ঐখান হইতেই আওয়াজ আসিতেছে না?

খট্।—বারান্দার মৃদু আলোটা জ্বলিয়া উঠিল। অভয়াচরণ দেখিলেন সেটা একটা মানুষের দেহ চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। 'আঁ—আ—আ—আ' একবার নড়িয়া চড়িয়া সেটা স্থির হইল। অভয়াচরণ তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন দেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে।

অভয়াচরণ চাকরবাকর কাউকে ডাকিবেন কিনা ভাবিতেছেন; কী-ই বা হইবে ডাকিয়া? দুর্য্যোগের রাতে রাস্তার কোন্

ভিখারী গৃহকর্ত্তার ভাগ্যবশে তাঁহার দাওয়ায় মরিবার জন্যই আশ্রয় লইয়াছিল। কাল না হয় ডোমে সে দেহ টানিয়া লইয়া যাইবে।

অভয়াচরণ ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ শবের বুকের কাপড়ের উপর কি একটা জিনিষ বিজলীর আলোয় চিকমিক করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অভয়াচরণ উবু হইয়া দেখিলেন তৈলাক্ত একখানি নোংরা সূতার ডোরে বাঁধা একটি ছোট সোনার লকেট, তাহাতে কাহার ছোট একখানি ছবি।

ছবিখানি ভালো করিয়া দেখিতেই অভয়াচরণের মুখ পাংশু বর্ণ হইয়া গেল, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে এই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসিলেন! শবের ছায়ায় ঢাকা মুখখানি দুইহাতে হঠাৎ আলোর দিকে ফিরাইয়া অভয়াচরণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, এ সেই ঘৃণ্যা গণিকা যাহাকে ছয় মাস পূর্ব্বে তিনি পনের দিন কয়েদ করিয়াছিলেন এবং পাঁচমাস পূর্ব্বে এই বাড়ী হইতে লাঞ্ছনা করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

তিনি যেন হঠাৎ জ্ঞান হারাইলেন। মেরুদণ্ড বাহিয়া মস্তিস্ক পর্য্যন্ত একটা যেন তুহিন শীতল স্পর্শ তাঁহার দেহের মধ্যে নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সুদূর অতীতের কতগুলি ঘটনা চলচ্চিত্রের মতো তাঁহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

বাইশ বছরে এম্ এ পাশ করিয়া তখন সবে তিনি গাঁয়ের বাড়ীতে যাইয়া জমিদারী দেখিতেছিলেন। তখন রমেশ ভট্টাচার্য্যের

বালবিধবা মেয়ে কমলার রূপ ছিল, যৌবন ছিল। অভয়াচরণেরও ও দুইটী জিনিষ যথেষ্ট ছিল কিন্তু তার চাইতেও অপর্য্যাপ্ত ছিল অসংযত লালসা। হঠাৎ কমলাকে গ্রামে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তার দিন পনের পরে জমিদারীর কাজ ভাল লাগে না বলিয়া ডেপুটিগিরির খোঁজে তিনি কলিকাতা গেলেন। বছর না হইতে বাসিফুল অভয়াচরণ পথের ধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া ডেপুটিগিরি যোগাড় করিয়া ছাড়িলেন এবং ছাব্বিশ বৎসর বয়সে একটি বাইশ বৎসরের যুবতী কুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। সে কি আজের কথা? চব্বিশ বছর—দুই যুগ পূর্ব্বে। সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়া অভয়াচরণের হঠাৎ মনে হইল ঐ যেখানে লকেটটি চিকমিক করিতেছে ঐ পীবর বক্ষে উপাধান করিয়া কত বিনিদ্ররজনী তিনি কামাতুর দেহে ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন —মাথার উপর তেমনই রাত ভোর একখানি নরম হাতের স্নেহাতুর অঙ্গুলিগুলি তাঁহার বিস্রস্ত চুলে বিলি কাটিয়া চলিয়াছে! ঐ যে বসন্তচিহ্নদুষ্ট শীর্ণ অধরোষ্ঠের উপরে কৃষ্ণতিলটি আজও জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে উহারই উপরে কত দিন নিজের তপ্তওষ্ঠ চাপিয়া চাপিয়া ক্ষয়াইয়া ফেলিয়াছেন, তবু তৃষ্ণা মেটে নাই!

সহসা অভয়াচরণ দেখিলেন তাহার অসাড় শক্ত হাতের মুঠার মধ্যে একখানা কাগজ। টানিয়া আলোয় ধরিয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা আছে,—"আজ আমার আনন্দের অবধি নাই যে তোমাকে আর ভালবাসি না। ষোলো বছর বয়সে জীর্ণবাসের

মতো এই কলিকাতাতেই ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে; তবু এত দীর্ঘ বৎসর পরে তোমারই হাতে আদালতে শাস্তি পাইয়াও তোমার ছবিখানি শুদ্ধ এই তুচ্ছ পদার্থটা বিক্রী করিয়া মুক্তি পাইতে চাহি নাই। গণিকা জীবনে এক একদিন মনে হইত এর চাইতে মরি নাই কেন; আজ মনে হইতেছে তোমার মতো মানুষের উপর অভিমান করিয়া মরিবার মতো বোকামি আর কিছু হইত না। মরিবার আর তোমারই বা ক'দিন আছে?—কিন্তু নিজে এত অপরাধী হইয়াও সে দিন যে অপমান করিয়া আমায় বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছিলে সে-দিনই বুঝিয়াছি তোমার চাইতে একটা ডাকাতেরও দয়ামায়া আছে—হৃদয় বলিয়া একটা পদার্থ আছে। অবশ্য আমায় তুমি চেন নাই কিন্তু তাহাতেইত তোমার স্বরূপ আরো স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। চিনিলে নয় বুঝিতাম লোক-লজ্জা-ভয়ে আমায় তাড়াইলে। যে ছেলেকে স্পর্শ করিতে দেখিয়া সেদিন তুমি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলে ঠিক অমনি তোমারই আর একটি শিশু আমার পেটে জন্মিয়াছিল—সে না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে। তুমি সে খবর জানো না। বাপকে ছেলের খবরটা দেওয়া নিশ্চয়ই অনুচিত হইল না। পাঁচ বছর ছেলেটা বাঁচিয়াছিল, ততদিন ভালোছিলাম। আবার তোমার কারাদণ্ড পাইয়া অবধি আর একবার ভালো হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। শেষে দেখিলাম সে-সব বোকামি। আজ মরিতে বসিয়াছি, জানি আমার এ রাত পোহাইবে না। তাই এই

আসন্ন দুর্য্যোগেও রুগ্ন দেহখানি টানিয়া টানিয়া তোমার দুয়ারে আনিয়া ফেলিয়াছি। এও আমার আর একটা সখ। এই দেহটাই শুধু চাহিয়াছিলে, তাই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার কালে তোমারি দয়ায় এ-অবস্থায় পরিণত দেহটাকে তোমায় উপহার দিয়া যাইবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিলাম না।”

সভয়ে অভয়াচরণ শবের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন সাম্‌নের মুক্তা শুভ্র দাঁতগুলির উপর আলো পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে। ব্যাধি-ক্ষত দুষ্ট নীচের ঠোঁটটা চিরিয়া যেন একটা চাপা উপদ্রুত হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

একখানি চিঠি।

প্রিয়তমাসু,—

আজ সকালের ডাকে তোমার চিঠি পাইনি। কেন? অথচ আজ তো পাওয়া উচিত ছিল। একদিন পর একদিন দাড়ি কামানোর মতো তোমার চিঠি পাওয়াটাও এখানে এসে অবধি আমার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। উপমাটা শুনে রেগো না,— ঝাঁ করে কথাটা মনে এলো লিখে ফেল্লুম। দাড়ি কামানোর ব্যাপারটা যে পরিমাণে অসীম বিরক্তিকর, তোমার চিঠি পাওয়াটা

ঠিক ততখানি মধুর বলেই বোধ হয় দুটো কথা একসঙ্গে মনে পড়ে গেল। জানোইতো **Two extremes meet !**

তোমায় দুটি জিনিষ পাঠাচ্ছি,—দুটী ফুল,—আর সঙ্গে এদের ক্ষুদ্র একটী কাহিনী। এরা পাশা-পাশি ফুটেছিল দুটি গাছে। এত অযত্নে গোলাপ গাছ হোলো কি করে জানি নে। পাহাড়ী মাটীর বুক ফুড়ে তারা কালো কালো পথরের ফাটল দিয়ে উঁকি মার্‌ত। যখন দক্ষিণা হাওয়া বইত, এ ওর গায়ে পুটিয়ে পড়ে কত চুমোই যে খেত কত সুন্দর প্রভাতে, কত নির্জ্জন সায়াহ্নে, হয় তো বা কত নিস্তব্ধ দুপুর রাতে! এরা যেন প্রণয় সাগর পারের যুগলযাত্রী।……জায়গাটী দিব্য মনোরম তাই রোজই প্রায় সেখানে বেড়াতে যাই। সাম্‌নে ধূ ধূ করে মাঠ,—দূরে চক্রবাল রেখায় গিয়ে থাকে থাকে দু তিন সার নীচু পাহাড়ের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। মাঝখানেও এব্‌ড়ো খেবড়ো দুটো চারটে পাহাড়ের চাপ ঝাঁকড়া চুলওয়ালা, দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে মহুয়া গাছের লেখা জোখা নেই, তাদের পাতার রাশে 'পচিয়া' * হাওয়া দিন রাত করুণ বাঁশী বাজিয়ে যায়। একটী তির্‌তির্ করে বয়ে যাওয়া ঝর্‌নার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চাপান মস্ত মস্ত কতগুলা পাথরের খণ্ড। তারি একটার উপরে বসি, আর চার পাঁচ দিন

* পশ্চিমা হাওয়াই বৈদ্যনাথের এদিকে স্বাস্থ্যকর, তাহাকে এদেশ-বাসী সাওতালীরা "পচিয়া" বলে।

থেকে এই লাল সাদা গোলাপ দুটোর চুম্বনে লীলাখেলা দেখি,... আর বসে বসে তোমার কথা ভাবি,—তুমি যে কাছে নেই।

পরশু পয়লা ফাল্গুন। গিয়ে দেখলাম গোলাপটা আরও টক্‌টকে লাল; বুকের মাঝের পাঁপড়ি ক'টিও মেলে ধরে সে তার সুরভি সম্ভার উজার করে দিচ্ছে,—নবীন বসন্তের হাওয়া তাকে যৌবনের বরদান করেছে। সাদা বড় গোলাপটা দেখি ম্লান, সে আর বসন্তের অপেক্ষা করেনি শীতের শেষেই সে তার যা কিছু মধু ঐ আধফোটা কিশোরী প্রিয়াকে নিবেদন করে দিয়েছিল, এখন শীতের কুজ্ঝটিকার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অভাগা রিক্তসর্ব্বস্ব সে দেখে আজ লাল গোলাপ যৌবনের জোয়ারে নিজের চোখ ঝলসানো রূপ দেখে রূপের গরবে ভোম্‌রার স্পর্শে গুন্ গুণানির তালে তালে ঢলে ঢলেই সারা, তার পানে চাইবার তার আর ফুরসুৎ নেই। আজ কাঙ্গাল তার ব্যথাভরা ভাঙ্গাচোরা বুকের করুণ দীর্ঘশ্বাস উবে যাওয়া সুবাসের সঙ্গে লালের মুখে কেবল বুঝি আরো লালিমার ছোপ যোগায়! হারে অদৃষ্ট!

কাল বিকেলবেলা সেখানে গিয়ে বসেছি, দেখি লাল আরো গাঢ় হয়ে রঙ্গিয়ে উঠেছে, সাদা ফুলটা থেকে গোটা দুই পাপরি কালো পাষাণের উপর অশ্রুবিন্দুর মতো ঝরে পড়েছে। আমি শুধু এদের দেখেই যাচ্ছি, ছিড়্‌তে ইচ্ছে করে না।...কতক্ষণ পরে একদল স্ত্রী পুরুষ সেখানে ফোটো তোল্‌বার নটবহর নিয়ে

হাজির হোলো। এক ছোক্‌রা বল্লে “বাঃ খাসা লাল গোলাপটী তো,—” তার পর সেটাকে ছিঁড়ে বোঁটা সমেত বোতামের ঘরে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। ইস্ত্রী দিয়ে পাট করা সাদা ফ্লানেলের ওপোনব্রেষ্ট কলারের ওপর সেটা যেন ফিক্‌ ফিক্‌ করে হেসেই সারা। একটি মেয়ে বল্লে “দিব্যি সাদা ফুলটীও তো” বলে সেটাকে বোঁটা সমেত খুলে খোপায় গুজে দিলে;—টানের চোটে আরও গোটা কতক পাঁপড়ি ঝরে প'ড়লো। তার পর তাদের ছবি তোলা হোলো গল্পগাছা হোলো। শেষে লাল গোলাপটা খুলে নিয়ে ছেলে মেয়েরা এ ওর গায়ে ছোড়াছুড়ি করে কত রঙ্গ করলে,—তার পর 'দূর ছাই খারাপ হ'য়ে গেছে' বলে এক ছোক্‌রা সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিলে। কিন্তু সেই মেয়েটী সাদা ফুলটাকে কিন্তু খোপাতেই পূরে রাখলে, নষ্ট হতে দিলে না। ঘণ্টা দু'এক পরে তারা সব জট্‌লা করতে করতে চলে গেল। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমিও অন্যমনস্ক হ'য়ে বাসায় যাব বলে উঠে দু'পা' এসেছি,—সাম্‌নে দেখি দলিত পিষ্ট লাল গোলাপটী রাঙ্গা মাটীর পথখানির ধারে আধমরা দুর্ব্বার ওপরে পড়ে আছে,—আর তারি পাশে সাদা গোলাপটীও! বোধ হয় চলে যাবার বেলা অতর্কিতে সেই মেয়েটীর খোপা থেকে সেটা পড়ে গিয়েছিল। সেটাতে তখন মাত্র দশ বারোটি পাঁপড়ি আছে,—বাকীগুলি উচু থেকে পড়ার চোটে তার চার পাশে ঝরে পড়েছে।

একখানি চিঠি।

আমি দুটীকে এক হাতের মুঠায় করে বাড়ী নিয়ে এলুম। ......পথে ফিরতে বার বার মনে পড়ছিল "In their death they were not divided."......এই পুষ্প দম্পতীর ইতিহাস সমেত তাদের শেষাবশেষ তোমায় পাঠালুম। আজ বিকেলে সেখানে গিয়েছিলুম, গাঁছ দুটিতে আর কুঁড়ি আছে—কিনা, আর ফুল ফুটবে কি না বিচার করতে গিয়ে দেখি, দুটো গাছের মাঝখানে পাশের আমগাছটা থেকে একটা মরা ডাল ভেঙ্গে পড়ে আছে! কাল পরশু গাছ দুটোর কাছে যাইনি বলে সেটা লক্ষ্য করিনি।

তুমি হয়তো বলবে—যেমন তুমি সর্ব্বদাই বলে থাক—'এটা একটা "বোকা গল্প"—তা বল। কিন্তু আমি ক'দিন থেকে ফুলদুটীকে দেখে দেখে তাদের সুখ দুঃখের সন্ধান পেয়ে হাসি কান্নার অংশীদার হয়েছি। এদের দেখে আমি আনন্দ পেয়েছি, দুঃখও পেয়েছি। আমার আনন্দ বেদনার পরস্পর অর্দ্ধেকটা চিরকালই তোমার—তাই তোমায় এ পাঠানো। পাঠিয়েই আমি খালাস তুমি উপভোগ করিতে পারো না পারো তা তোমার জিম্মায়।

চিঠি তোমার আজ পাইনি বটে, কিন্তু আমার মনে বলছে, তুমি নিশ্চয়ই ভালো আছ। তুমি আমার আমার—না, কিছু জেনো না, কিছু নিওনা, তুমি আজ সারা দিন আমায় জ্বালিয়েছ। নিশ্চয় বন্ধু নীহারের বাড়ী গিয়ে চিঠি ফিটি

লেখার কথা সব ভুলে ছিলে, আমি অভিসম্পাৎ কচ্ছি, নীহার যেন যতীন বাবুর চিঠি সারা বসন্ত কালটা জুড়েই না পায়—আর যেন তেরাত্তির পেরুতে না পেরুতেই একটী ঝগড়াটে সতীন জোটে।—ইতি।

তোমার—

নন্দিতা।

সেদিন সত্যিই ক্ষ্যাপা শ্রাবণ আশ্বিনের আঙ্গিনায় ছুটে এসেছিল। সকাল বেলা থেকে ঝর ঝর অবিরল ঝর্‌ছেই, কিন্তু গৃহিণীর আমার তা' দেখে 'দর দর চোখে বহে বারি' গোছের কোনো কিছু অবস্থা ত ঘটেই নি বরং বাল্য সখীর ক'লকাতা আগমন সংবাদে আহ্লাদে আটখানা হয়ে সখি-সম্ভাষণে জোড়াসাঁকো চলে গিয়েছিলেন। তাঁর অন্তর্ধ্যানের পূর্ব্ব মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁর সখী সংবাদের কোনো পাত্তাই পাইনি। পূজোর ছুটীতে আফিস বন্ধ, কাজেই একটু দেরীতেই খেয়ে দেয়ে বারান্দায় বসে পান চিবুচ্ছি এমন সময় দেখি পুরাণো চাকর ভজহরি এক ফিটন এনে বাড়ীর দুয়ারে হাজির করলে। জিজ্ঞাসা করলুম "গাড়ী কেন রে?" "মা জোড়াসাঁকো যাবেন বল্লেন" 'কখন'?—'এখনই'—একবার ভাবলুম বাড়ীর ভেতরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি কেন এবং কোথায় যাওয়া হচ্ছে—আবার

ভাবলুম কাজ কি ছাই অত গায়ে পড়ে হিসেব নিকেশের—নিজেই তো যাবার বেলা বলেই যাবেন এখন, সে সময় একটু টিপ্পনি কাটবার ফুরসুৎটুক হারাই কেন। যথাসম্ভব মুখখানাকে আকাশভরা মেঘের মতই গম্ভীর করে গোঁজ হয়ে ইজি চেয়ারটায় বসে রইলুম। আধঘণ্টাখানেক পরে গিন্নি লঘুপদে বকুল ছড়ানো দক্ষিণা বাতাসের মতো কেশ বেশের মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে কালো মেঘে বিজলী চমকের মত বাণারসী শাড়ীর জরির আঁচলখানি পেছনে উড়িয়ে টেনে নিতে নিতে বলে গেলেন "শোবার ঘরে টিপয়ের ওপরে তোমার জলখাবার রেখে এসেছি—খেয়ো। আমি সন্ধ্যে নাগাত ফিরবো, একবার সুরুচির ওখানে যাচ্ছি,—ও আজ সাত আট দিন হোলো এসেছে, এর আগেই আমায় যাওয়া উচিত ছিল।—তা বুঝলে, তুমি যেন বাড়ী থেকে বেরিয়ো না ভজকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি জবাবের অপেক্ষা না রেখেই গাড়ীতে উঠ্‌লেন। আমি একটু টীকা-টিপ্পনীর জল্পনা কল্পনা করে রেখেছিলুম, তার নেহাতই সদ্ব্যবহার হোলো না দেখে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে একটু পরে চট্ করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে, একরাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ফুঁ দিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে ফের ঠিক হয়ে বসতেই দেখি বৃষ্টির ধোয়াটে ধারা ভেদ করে কে একজনা রাস্তায় সদর দরজা খুলে আমার পানে আস্‌ছে। মাথায় একটা তার জীর্ণ ছাতা, পায়ে চামড়ার স্যাণ্ডেল, গায়ে একটা আধময়লা

পাঞ্জাবী। টিপে টিপে পা ফেলে কাদা থেকে গা বাঁচিয়ে সে আস্‌ছিল; ঘর থেকে হাত কুড়ি দূরে থাক্‌তেই আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম "কি হে সুপ্রিয় বাঃ তুমি কোত্থেকে?"—ততক্ষণে সে বারান্দায় উঠে পড়েছে। আমি আধভেজা কাপড় চোপড়েই তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লুম "উঃ কতদিন তোমায় দেখিনি,—পা-চ-বছর! বল বল শীগগির বল বিশ্বের ঝড় বাদল মাথায় করে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার মতো কোত্থেকে এলে?"—

"ছাড়্‌ ছাড়্‌ ষ্টুপীড্‌, দম্‌ আট্‌কে মেরেই ফেল্‌বি তুই দেখ্‌ছি। আধমরা হয়েই তো প্রায় এসেছি।" আমি তাকে ধপ্‌ করে পাশের চেয়ারটাতে বসিয়ে দিলুম। তার পর দৌড়ে আল্‌নার ওপর থেকে কাপড় জামা চটি নিয়ে এসে তাকে দিলুম।

"কাপড় জামাগুলো ছাড়,—তার পরে বল"—সে ধীরে ধীরে কাপড় চোপড় ছাড়তে লাগ্‌ল, সেই ফাঁকে সকৌতুক দৃষ্টিতে আমি তার চেহারা পরীক্ষা করে নিচ্ছিলুম। সুপ্রিয় মিত্র ছিল আমার কলেজের সহাধ্যায়ী বন্ধু। ক্লাসের সেরা ছেলে ছিল সে,—সে ছিল যেম্‌নি সেরা আমি ছিলুম তেম্‌নি ওঁছা। তবু আমাদের দুজনের বড্ড ভাব ছিল; কেন তা হোলো, কেমন করে তা হোলো তা জানিনে, বোধ হয় এটা **Two dissimilar poles attract** কথার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত। চেহারাতেও আমরা দুজনা সম্পূর্ণ তফাৎ ছিলুম।

সে ছিল ক্ষীণদেহ, খর্ব্ব, ফর্সা ; আমার Surname ছিল ক্লাসে Black Apollo. আমি কোন বার ফেল না করলেও ম্যাট্রি-কুলেশন থেকে বি-এ পর্য্যন্ত ইউনিভার্সিটিকে নির্ম্মমভাবে ফাঁকি দেওয়া সত্ত্বেও বোধ হয় ইউনিভার্সিটির ভুলেই ক্যালকাটা গেজেটে বরাবর তৃতীয় বিভাগে,—বি-এতে পাশ কোর্সে নাম্‌টা উঠ্‌তে দেখে এসেছি,—এবং সেই একই গেজেটে সুপ্রিয়ের নাম বরাবর সর্ব্বোচ্চ স্থানে দেখে এসেছি। তার পর বি-এ তে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম হয়ে সুপ্রিয় এম্‌-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়, আমি বিলেত চলে যাই। ফিরে এসে আমি এই দুবছর চাকরী করছি,—কিন্তু সুপ্রিয়ের খবর এর মধ্যে বড় আর পাইনি। প্রথমে দু'চার খানা পত্র ব্যবহার হয়েছিল,—কিন্তু তার তরফ থেকেই শেষে বন্ধ হয়ে যায়। দেশে ফিরেও,—বিশেষত আমার বিয়ের আগে তার অনেক খোঁজ করেছিলুম কিন্তু কোন পাত্তা পাইনি। এতদিন পরে সেই প্রিয় বন্ধুকে দেকে কি এক অব্যক্ত আনন্দই না হচ্ছিল! সে কাপড় ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে তাকে দেখ্‌লুম তার শুক্‌নো শরীর আরো শুকিয়েছে, হাত পায়ের শিরাগুলা স্পষ্ট হয়ে ফুলে উঠেছে, গাল দুটা আরো বেশী ভেঙ্গে গিয়েছে তার ওপর আর স্বভাবতঃই চোখা নাকটা মোগলাই খাঁড়ার মতো দেখাচ্ছে, প্রতিভা-দীপ্ত চোখ দুটী তার আগের চাইতে বসে গিয়ে থাকলেও কি একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা তাতে ফুটে উঠেছে, চুলগুলা রুক্ষ, কতকাল যেন

তেল পড়েনি, দু একটা গুচ্ছ তার শুভ্র প্রশস্ত ললাটের ওপর এসে পড়েছে।

কাপড় চোপড় ছেড়ে পকেটের খুচরা জিনিষ পত্রগুলা গায়ে দেওয়া জামার পকেটে পুরে সে চেয়ারে বসে দুহাতে চিবুকটা রেখে বল্লে—"তারপর ?"—

ধাঁ করে আর একটা নূতন বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়্ল —তার একটা দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্য,—যা তার আগে মোটেই ছিল না। আর মুখে কি একটা বিষন্নতার ছাপ, যেন তরুণ ঝাউ গাছের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঘুর্ণী বায়ু বয়ে গিয়েছে। আমি কি যেন একটা বিদ্রূপের কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, ঠোঁটের আগে এসে পড়া কথাটাকে কোনো মতো রাসটানা ঘোড়ার মতো সংযত করে শুধু বল্লুম "কেমন আছ, কি কচ্ছ ?"

"সম্প্রতি বাড়ী থেকে তোর খবর নিয়ে দেখা কর্‌তে আস্‌ছি, আছি একরকম।"

"এত শুকিয়ে গিয়েছ কেন ?"—আর একটু সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করলুম্ "আর যে-তোমার জ্বালায় প্রফেসাররা সব সন্ত্রস্ত থাক্‌তেন, আর আমরা সব মসগুল থাক্‌তুম সে ঠিকরে পড়া হীরের আলোর মতো অবাধ বাক্যভঙ্গিমাটুকু কৈ ? ঠোঁটের আগে লেগে থাকা সহজ হাসিটুকুই বা কোথা হারিয়ে এসেছো ভাই ?"

সে ফিক্ করে একটু হাস্‌লে। তারপর কেস থেকে একটা

চুরুট নিয়ে ধরিয়ে মিনিট তিনচার চুপ চাপ বসে টান্‌লে, তারপর হঠাৎ অর্দ্ধ দগ্ধ চুরুটটা বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার পানে চোখ তুলে বল্লে—"দ্যাখো ভাই আমি আর পারি নে,—এ বোঝা নিয়ে আর বেড়াতে পারি নে, সমদুঃখী হিসাবে তোমাকে আজ আমায় বল্‌তেই হবে। তুমি এর দুর্ব্বিসহতা কিছু এমন কমাতে পারবে না জানি,—কিন্তু তোমায় এই নিছক বলাতেই একটা আনন্দের আভাস আমি পাচ্ছি, সেই জন্যেই আমায় বল্‌তে হবে।

'তুমি তো সেই বি-এ পাশ করে বিলেত চলে গেলে, আমি, এম্‌ এ ক্লাশে ভর্ত্তি হলুম। কিন্তু fifth year এর মাঝামাঝি আমার হোলো কালাজ্বর। তাতে বছর দেড়েক ভুগে যখন দুটী সেসন মাটি করে ফের গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হলুম তখন Scholarshipটাও গেছে আমাদের অবস্থা এমন স্বচ্ছল ছিল না তা তুমি জানো। এমন সময় আমার ছোট বোন্‌টির বিয়ে দিয়ে বাবা হাজার তিনেক টাকা দেনা করে ফেল্লেন। তার ওপরে আমার কল্‌কাতার এম্‌-এ পড়ার খরচ জুগিয়ে এই দেনা শোধ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমি ভাবলুম একটা টুইশনি কোরবো তাতে যদি টাকা পঞ্চাশেক পাই তবে তাঁর আমাকে তো খরচ দিতেই হবে না বরং বাবাকে তা থেকে অন্ততঃ গোটা পনেরো টাকা মাসে পাঠাতে পারবো তাতে তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতারও কিছু আসান হবে। ভেবে ইংলিসম্যানে বিজ্ঞাপন

দিলুম। কিন্তু ভালো চাকুরী একটাও জুটলো না,—ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকার বেশী কেউ দিতে রাজী নয়—। হঠাৎ একদিন আমার মামাতো ভাই সেই ফক্কড় সুরেশটা বল্লে তার এক বন্ধুর বোন্‌কে আমি যদি পড়াই তো তারা পঞ্চাশ টাকা করে দিতে পারে। তার পরে চোখের কোণায় একটু বাঁকা হাসি টেনে সে বল্লে যে 'সাহস থাক্‌লে এ চাক্‌রি নিও'। যদি বা মেয়ে পড়াতে হবে বলে এ চাকুরী না নিতুম, ওর টিপ্পনি শুনে সেই দিনই সেই মেয়েটার ভাইকে কথা দিয়ে এলুম। তারা ভাই বোনে এক রায় বাহাদুরের ছেলেমেয়ে।

যতীনসিংহের 'ধ্রুবতারা' আমার না পড়া ছিল তা নয়, এবং ভালোবাসা জিনিষটা সম্বন্ধে আমি কিরকম ভয়ানক স্কেপটিক ছিলুম তাও তুমি জানো,—তবু ঠিক করলুম বিশেষ সমীহের সঙ্গে আমায় ছাত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, একটা বিরাট গুরুজনোচিত গাম্ভীর্য্যে নিজকে সব সময় মুড়ে রাখাই শ্রেয়ঃ তা ছাড়া তার থেকে একটা বিশেষ দূরত্ব রক্ষা করে চলাই সর্ব্ব প্রকারে সমীচীন।

পড়াতে তো লাগলুম, কিন্তু তখন যদি জানতুম হাজার উপন্যাস পঠনজাত অভিজ্ঞতা, মজ্জাগত স্কেপটিসিজম্‌ যোগীর মতো গাম্ভীর্য্য সব এক লহমায় দুটী পাৎলা রাঙা ঠোঁটের হাসির নিশ্বাসে উড়ে যেতে পারে তবে, না খেয়ে মরে গেলেও আমি সে চাকুরীতে যেতুম না, সে সর্ব্বনাশীর সে হৃদয়হীনার,—

না না সে পূজার ফুলটির সান্নিধ্যে যেতুম না। না না,—বুঝ্‌লে সে সত্যিই ভালো ছিল—হয়তো বড্ড ভালো ছিল।" এই বলে কিছুক্ষণ সে যেন বুকের মধ্যে কি খুঁজে নিলে তার পরে আরম্ভ করলে,—

"প্রথম যেদিন তাকে দেখি এমনি বর্ষা, বেলা বারোটা থেকে আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল। কালো কালো জমাট মেঘের রাশ চলন্ত পাহাড়ের মতো আকাশে ভেসে এসে ক'লকাতার মাঠে বাটে ইমারতে সশব্দে নিজেদের বুকের বেদনা উজাড় করে দিচ্ছিল। যখন কলেজ ছুটি হোলো তখনো মুষলধারে জল পড়ছে। সুরেশের বন্ধুকে সঙ্গে করে তো ক্লাস থেকে বেরুলাম, সিঁড়িতে পা দিতেই কড়্ কড়্ করে একটা বাজ পড়লো। পেছন থেকে সুরেশটা বিশ্রীরকমের হেসে চেঁচিয়ে বল্লে "যাস্‌নে সুপ্রিয়, বাধা পড়েছে আজ যাস্‌নে" আমি একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি তার পানে ফেলে এগিয়ে চল্লুম। কালিতলায় গিয়ে—দেখি ক'লকাতা ভিনিস্ এ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। সারি সারি ট্রাম মোটরের সার দাঁড়িয়ে, ঘোড়াগুলা কোনো মতে ছপ্ ছপাং ছপ করতে করতে মৃদুগতিতে গাড়ীগুলাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কতকগুলা কুলীর ছেলে খোলা জলে মনের আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। আমরা জুতা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে কোনো মতে কাপড় বাঁচিয়ে এগিয়ে চল্লুম। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অন্য মনস্ক এবং বিব্রত হয়ে থাক্‌বার

যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও আমার বুকের ভেতরে কেমন যেন টিপ্ টিপ্ কচ্ছিল। ভাবী ছাত্রীর একটা আবছায়া কল্পনামূর্ত্তি মাঝে মাঝে নানা দৃশ্য ও চিন্তাজাত হিজিবিজি ভাবতরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি ঝুঁকি মারছিল।

তাদের বাড়ী গিয়ে যখন হাজির হলুম তখন বেশ বিচিত্রতার চরমসীমায় উঠেছে। হাতে জুতো, মাথায় ভেজা ছাতা, গায়ে ভেজা সার্ট, পরণের কাপড়ের অবস্থা ততোধিক শোচনীয়, চাদরটাতে বৈ গুলা জড়ান! যাহোক্, জানোই তো বেশভূষার-দিকে তেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার কখনই ছিল না।

প্রথমদিন পাড়া শুনা হোলো না। ছাত্রী এলো। পরিচয় হোলো। দু'চারটা এ-ও-তা কথা বার্ত্তার পরে বিদায় নিলুম। সেদিনকার মতো লাভ হোলো এক প্লেট খাবার আর আস্বার সময় ভক্ত পূজারিণীর মতো ভূমিতে ললাট স্পর্ষ্ট-করা একটী নম্রসুন্দর প্রণাম।

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। এ পর্য্যন্ত তাহলে কোনো ভয়ের কারণ নেই। নেহাৎ সাধারণ চেহারার মেয়ে। ছিপ্‌ছিপে একহারা চেহারা, ফর্সা রং হলেও তা চপলার মতো তীব্র চমকে চোখ ঝল্‌সায় না, মামুলী চোখ, হীরের ছুরির মতো তা বুকে তো বেঁধেই না বরং একটু করুণারই উদ্রেক করে। স্বাস্থ্য খুব ভালো নয় বলে, উনিশ বছর বয়েস হলেও কৈশোরের স্বচ্ছ সৌকুমার্য্য টুকু অপসৃত হয়ে এখনও যৌবনের কুলপ্লাবিনী

উচ্ছলতার উৎস ফোটেনি। একটি শান্ত নম্রতা দেহের প্রত্যঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা যুগপৎ স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, পাগল করে না। মনটা ভারী খুসী হয়ে উঠ্‌ল। এতক্ষণের বুকের মাঝে দপ্‌দপানির কথা মনে করে একটু লজ্জাই হচ্ছিল।

সে সেবার আই-এ, দেবে। পরীক্ষা সাম্‌নে, অথচ ইংরিজীটা তার মোটেই তৈরী হয় নি, সেই জন্যেই বিশেষ করে আমায় রাখা। ওদের নানান্‌ ইংরেজ কবিদের একটা সিলেক্‌শন ছিল সেইটা আগে স্থুরু হোলো পড়া। পড়াশুনা বাড়ীতে বেশী না করলেও আমি যে সময় পড়াতুম তার তাতে মনোযোগ ছিল। তুমি জানো রোমান্টিক পিরিয়ড্‌এর কবিদের কাব্য কলায় আমার একটা বিশেষ মোহ ছিল। সেগুলা পড়্‌তেও যেমন তন্ময় হয়ে যেতুম, পড়াতে পড়াতেও তেম্‌নি আমি আমাকে হারিয়ে ফেল্‌তুম। যখন হঠাৎ মোহাচ্ছন্নতার জাল থেকে আংশিক ছাড়া পেতুম তখন শুধু খেয়াল হোতো, ছাত্রীর যুগ্ম আঁখি যেন শেলির মতো অজানার সন্ধানেই সন্ধ্যাতারার মতো জ্বল্‌ছে। অ্যাডিসনের রচনা পড়বার দিন পড়া ভালো জম্‌তো না, এ-ও তা পাঁচ কথা হোতো।

সেদিনও তেম্‌নি গদ্য পুস্তকে ছাত্রী শিক্ষক কারু মন বস্‌ছিল না। নানান সাত পাঁচ কথার পরে হঠাৎ আমায় সে জিজ্ঞেসা করলে "বড়দিনের ছুটীর তো মাত্র দিন ছ' সাত বাকী আছে, ছুটীতে কোথায় যাচ্ছেন ?"

"বাড়ী যাবো বোধ হয়।"

"বাবাগো বাবা, কি ছুটীতে বাড়ী গিয়েও আপনাদের সখ মেটে না,—তবু তো আপনার বাবা-মা এখানেই থাকেন।"

"জানেনই তো বাড়ীমুখো বাঙ্গাল ধায়,—তা ছাড়া—"

"বাড়ীতে আপনার খুব বিশেষ কোনো কাজ আছে নাকি ?"

"হ্যাঁ—তা ন—এমন কাজ আর একটা কি ?" উত্তরে শিষ্যা হাতের কাছে সাদা খাতাটার ওপরে লাল পেন্সিলটা দিয়ে অনর্থক একটা অক্ষর লিখে তার ওপর বার বার সেটা মক্স করতে করতে বল্লে "একটা কথা হচ্ছে—"

"কি বলুন না—"

"যদি আপনার কাজের কোনো ব্যাঘাত না হয়,—বাবাও একথা বল্‌ছিলেন—তবে আপনি ছুটীতে আমাদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আস্‌তেও তো পারেন। আমরা সবাই সেখানে যাচ্ছি কিনা,—তা ছাড়া Stopford Brooke এর বইটা আমার এখনো ধরাই হয়নি,—সেটাও শেষ হয়ে যেতো"—এই বল্‌তে বল্‌তে তার কানে কপালে গালে কে যেন একরাশ ফাগ ছড়িয়ে দিলে। আমি শুধু বল্লুম "আচ্ছা দেখি।"

সেই দিন তাকে কি যেন এক নতুন রকম করে দেখলুম। মাথার ভেতরে কেমন একটা ওলটপালট হয়ে গেল। তারপর আর কিছুতেই সেদিন অ্যাডিসনের আত্মার অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ

মস্তিষ্কে প্রবেশ করল না। তাড়াতাড়ি একটা কাজের কথা বলে বেরিয়ে পড়লুম। আস্‌বার সময় পুথির দিকে মুখ করে সে আবার বল্লে ওকথাটা ভুলবেন না, ভালো করে ভেবে দেখ্‌বেন।”

রাস্তায় বেরিয়ে কতকটা আত্মস্থ হলুম। তখন মনে হোলো, এতে আর আপত্তি কি হতে পারে। ফাঁক তালে পুরীও ঘুরে আসা হবে। ক্ষণকাল পূর্ব্বে ছাত্রীর সাম্‌নে নিজের অস্বাভাবিক জড়িমায় ভারী বিরক্ত হলুম। কিন্তু,—আবার মনে পড়লো সন্ধ্যারুণরক্ত সেই লালিমাটুকু, যা কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি করে তার সারামুখে তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। কি এ কেন এ নিঃশব্দ চরণে পা ফেলে অচেনা অনুভূতির ভেতর অবশেষে কি তাই এলো—দূর ছাই! যে সুঠাম দেহখানি আমার! তা ছাড়া আমি তার শিক্ষাগুরু,—আমি কী লক্ষ্মীছাড়া!

পরদিন পড়াতে যেতেই সহাস্যমুখে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে সে যখন আমায় জিজ্ঞেসা করলে আমি পুরী যাওয়া সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির করে ফেলেছি কিনা তখন আমার সমস্ত সঙ্কোচ প্রভাতের কুজ্ঝটিকার মতো উড়ে গেল। ছাত্রীর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মনখানি ভরে উঠ্‌ল। খুসী হয়ে বল্লুম “হ্যাঁ যেতে পারি হয়তো”—

“আবার হয়তো কি,—যাবেন নিশ্চয় কেমন?”—বলেই সে “যাই মামাকে বলে আসিগে” বলে ছুটে বেরিয়ে গেল। এর পূর্ব্বে তার ব্যবহারে এমন উচ্ছ্বাস আর কখনো দেখিনি।

চোখে মুখে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে সে ঘরে ফিরে এসে বল্লে "মাষ্টার মশাই আজ পড়া থাক, যাবার বিষয়েই গল্প হোক হ্যাঁ ভাল কথা কি কি বই নেবো,—ছুটী তো মোটে বারো দিন"? —"Stopford brooke নিন্ Addison খানা নিয়ে নিন্ আর পরীক্ষার প্রশ্নমালা" হ্যাঁ তাই ভালো হবে, কাঠখোট্টা বইগুলোকে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নেশায় যদি কিছু Soften করে নেওয়া যায়। জানেন মাষ্টার মশাই, পুরীর এ বাড়ীটাতে আমি একবারও যাইনি, এই নতুন তৈরী হয়েছে কি না। তা দাদারা একবার তৈয়ারী হবার পরেই কলেজ কামাই করে flying visit দিয়ে এসেছে, কিন্তু আমি সেবার কত মাথা খুঁড়লুম আমায় কিছুতেই সঙ্গে নিলে না। আর মেজদা কবি মানুষ কিনা এসেই সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দিরের যে বর্ণনাটা করলে তার অর্দ্ধেকও যদি সত্যি হয় তবে আমি—"

আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম "তবে আপনিও কবি হয়ে যাবেন"— "দূর, তাই বৈকি,—আমার মাথায় কবিতা আসেই না,—আচ্ছা মাষ্টার মশাই আপনি কবিতা লেখেন—"

"না"

"সত্যি না? আপনি কেন লেখন না,—লিখ্‌লে আপনি খুব ভালো লিখ্‌তে পারবেন" বলে সে রঙিয়ে ওঠ্‌ল।

"এঃ এত বড় ভবিষ্যদ্বক্তা আপনি কবে থেকে হলেন?"

"তাই বৈকি,—আমার অম্‌নি মনে হয়। আচ্ছা সমুদ্র আপনি আর কখনো দেখেছেন ?"

"চাটগাঁয়ে দেখেছি"—

"মেজ দা বলেন যে সমুদ্রের শোভা এমন যে বলে বোঝান যায় না,—Breakers গুলার কথা বলেন যে তা যেন রূপা-জরিপাড় নীলাম্বরীর হাওয়ায় ওড়া আঁচল,—সত্যি ?"

"কতকটা বটে" এম্‌নি আরো কত কি কথা হোলো, বলে তোমার ধৈর্য্যচুতি ঘটাব না,- কিন্তু শুধু এই টুকু জেনে রেখো সেদিন যখন বাড়ী ফিরলুম তখন আমার শিরায় শিরায় রি রি করে রক্ত বইছে। এও শোনো- হেসো না,—রাস্তায় একবার গরুর গাড়ী চাপা পড়বার যোগাড় হয়েছিল, তখন গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচক্যাঁচানি ছাপিয়ে তার মুখের তরল হাসির মিষ্টি আওয়াজ আমার কাণে বাজছিল। কে যেন আমায় গাড়ীর সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল।

তার তু' দিন পরে পুরী রওনা হবার কথা। কাজেই পরদিন নিজের হাতের ঘরোয়া কাজ কর্ম্মগুলা গুছিয়ে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা নিজের বাক্সটা গুছাচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখি সাতটা বেজে গিয়েছে। সাড়ে সাতটার সময় পড়াতে যাই, ভাবলুম আজ না হয় কিছু দেরী হবে। হঠাৎ মনে পড়লো কি একটা অসহ্য পুলকে আজ সারাটা দিন আমার কেটেছে ! বল্গাটানা ঘোড়ার মতো মনটা অমনি ঘাড় বাঁকিয়ে

বস্‌লো,—কেন,—এ উন্মত্ত আগ্রহ আমার কেন হবে, এ অপরাধ, অমার্জ্জনীয় অপরাধ,—নন্দিতার সঙ্গে না যাওয়ায় অস্বস্তিই আমার শাস্তি। আমি যাবো না।

বাক্স তেম্‌নি পড়ে রইল। আমি ছুটে বেরিয়ে পড়লুম—যাবো না, যাবো না, নিশ্চয়ই যাবো না।

গিয়ে দেখি নন্দিতা আমার দেরী হওয়াতে সেদিন পড়ার ঘরেই অপেক্ষা করছে।

"আসুন" বলে সে উঠে দাঁড়ায়েই আমার পানে তাকিয়ে বল্লে "এ কি আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে?"

আরো বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লুম,—আমি এত অপদার্থ যে মুখে চোখে অস্থিরতা ধরা পড়েছে।

ঠোঁটের কোনে একটু শুক্‌নো হাসি টেনে বল্লুম "না ও অম্‌নি আজ একটু রোদে ঘুরে অম্‌নি হয়েছে"।

"তবু ভালো,—দেখ্‌বেন এ চারদিনের মধ্যে আবার অসুখ বিসুখ করে বস্‌বেন না। আমাদের পুরীযাত্রা তিনদিন পেছিয়ে গেল কিনা,—মাসীমাও পরশু এখানে আস্‌বেন সেই জন্য—"

আমি বল্লুম "আমি পুরী যেতে পার্ব্বো না" অত্যন্ত বিস্ময়ে সে প্রশ্ন করলে "কেন?" "হঠাৎ কাজ পড়েছে তাই" একটু থেমে ফের বল্লুম "দেখুন আমার আজ রাতে বাসায় একটু বিশেষ কাজ আছে, আজ পড়াতে পারবো না—"

"আচ্ছা"—বাসায় ফিরে এলুম।

পরদিন পড়িয়ে ফেরবার সময় নন্দিতা বল্লে "আমি পুরী যাবো না" আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে মুখ না তুলে জবাব দিলে যে সমুদ্রের শোভা দেখ্‌বার আগ্রহের চাইতে তার পরীক্ষায় ফেল না হবার আগ্রহটা বেশী, তাই এখানে থেকে সে পড়াশুনা করবে,—কারণ পুরী গেলে সেটা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আবার মাথায় কত ওলট পালট ভাবনা এলো।

তারপর দুদিন আর সে সম্বন্ধে কোন কথা হয় নি। আমি কর্ত্তব্যের খাতিরে পড়িয়ে গেছি, সে কর্ত্তব্যের খাতিরেই শুধু শুনে গিয়েছে কি না বল্‌তে পারিনে, কিন্তু মুখের শ্রী ছিল জল ভরা শ্রাবণের মেঘের মতো। যাবার দিন ষ্টেশনে তাকেও দেখলুম। আমাকে দেখে নন্দিতার বাবা বলে উঠলেন "এই যে মাষ্টার মশাই **Very many thanks to you,**—আশ্চর্য্য যে আপনার শিষ্যত্বে নন্দিতার এতটা পড়ার লোভ হয়েছে যে সে পুরী পর্য্যন্ত যেতে চায় নি, অথচ সেবার অজিত ওকে নিয়ে সেখানে যায়নি বলে শুধু কাঁদতেই বাকী রেখেছিল।" আমি নিঃশব্দে একটু হাস্‌লুম। তিনি আবার বল্লেন "কিন্তু মাষ্টার মসাই আমাদের **next trip**এ আপনার নিশ্চয়ই যেতে হচ্ছে।"

বড় দিনের ছুটী গেল। তারপর যে দিন তাকে পড়াতে যাই সেদিন নিশ্চয় ভাবে বুঝলুম আমি মজেছি। আগুন যেমন পতঙ্গকে টানে, মাকড়সা যেমন কাঁচ পোকাকে নিঃশব্দে জালে গুটিয়ে নেয় আমিও তেমনি তার শ্রীতে, চাহনিতে, কৈশোর

সুলভ কমনীয়তায় ও নম্রতায় অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছি। তার যে গায়ের রংয়ে চপলার চমক খেলে না বলে আশ্বস্ত হয়ে ছিলুম সেখানে আমার চোখে আজ শরৎ প্রভাতের তরুণ অরুণের রঙ্ ধরে উঠেছে। যে চোখের দৃষ্টি একদিন শুদ্ধ করুণাই উদ্রেক করে বলে বলেছিলুম সে চোখ আমার হৃদয়াকাশে ম্লান সন্ধ্যায় উজ্জ্বল শুকতারা হয়ে ফুটে উঠ্ল, সেই কিশোরীর ফোটে-ফোটে-ফোটে-না সৌন্দর্য্য নব বসন্ত সমাগমে কোন্ অপূর্ব্ব লালিমায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্বে এই কল্পনায় আমি বিভোর হয়ে গেলুম, তার যে শান্ত নম্রতাটুকু প্রথম দর্শনে শুধু শ্রদ্ধা ও স্নেহের অর্ঘ্যই পেয়েছিল মাত্র, তা আমার হৃদ্‌মন্দিরে আজ ধূপসুরভিমিশ্রিত চন্দন পুষ্প সম্ভারের গন্ধ ছড়াতে লাগলো। দিনরাত শুধু ভাবতুম এ আমার হোলো কি? ঐ যে ছেলে-বেলায় একচক্ষু হরিণের রূপকথায় পড়েছিলুম যে যে-দিক নিরাপদ জ্ঞানে মূর্খ মৃগ অন্ধ আঁখি সারাদিন পেতে রাখ্ত, মৃত্যুর দূত সেই দিক থেকেই তার নিষ্ঠুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছিল,—তেম্‌নি যা আমায় পাগল করবে না ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলুম,—কোন্ যাদুদণ্ড স্পর্শে তাই-ই আমায় পাগলের চেয়ে পাগল করে তুলল!

ভাবলুম চাক্‌রী ছাড়্‌ব। এর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। নন্দিতা একথা ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পারার চাইতে যেন আমার মরণ আগে হয়। কিন্তু,—মনে পড়তো—তার বিগত

কয়েকদিনের ব্যবহার কি একেবারে নিরর্থক ?

একদিন বলে ফেল্লুম আর চাক্‌রী করব না। সে বিস্ময়ে যেন বেদনাহত দৃষ্টি আমার পানে পেতে বল্লে "কেন ?"—"ইচ্ছে নেই"—"কেন ?" "এত 'কেন'র জবাব দেওয়া যায় না" "দেবেন বেশ ছেড়ে দেবেন,—কিন্তু আমাদের কি ত্রুটি হয়েছে শুন্‌তে পাই কি ?" তার চোক ছল্‌ছল্‌ করে উঠ্‌ল, বোধ হয় নিজেদের অজানিত ত্রুটির পরিকল্পনায়।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লুম "না-না—আপনাদের আবার ত্রুটি,—আপনাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি, নিতান্ত আত্মীয়ের নিকট থেকেও তা আশা করা যায় না।"

"সত্যি ?" বলে সে আমার মুখের পানে চাইলে, পরে মুখ নামিয়ে বল্লে "তবে ?"—জবাবে শুধু বল্লুম "ভালো লাগে না।"

"ভালো লাগে না ? আমার মতো বোকা মেয়ে পড়িয়ে আপনার ভালো লাগে না তাই বুঝি—"

আমি ব্যাকুলভাবে বাধা দিয়ে বল্লুম "আপনি কি যে বলেন ঠিক নেই" "তবে ?"—"তবে ?"—আমার বুকের মধ্যে তখন ঝড় বইছিল শুধু বল্লুম "আর কৈফিয়ৎ টান্‌তে পারি না, এখন পড়ুন" স্বরটা যেন অস্বাভাবিক রকমের কড়া শোনাল।

নন্দিতা বল্লে "আপ্‌নি এখন পড়ান ছেড়ে দিলে আমি ফেল করব,—তাতে আমার মতো বোকা মেয়ের দুর্নামের চাইতে

আপনার দুর্নামটা লোকের কানে বাজ্‌বে বেশী জানেন”—একবার ফিক্ করে সে হাস্‌লে। “আপনি ফেল হবেন না”—

“আপনার Assurance পেয়ে সুখী হলুম, কিন্তু পরীক্ষাটা পর্য্যন্তও কি আপনার সুবিধা হবে না—আপনার পুরানো ছাত্রীর জন্যে এটুকুও”—বলে সে ফাউণ্টেন পেনটা তুলে নিয়ে তার নিবটা পরীক্ষা করতে লাগ্‌লো। তার সুগৌর মুখে মাঝে মাঝে রক্তের ঝলক্ খেলে যাচ্ছিল, মুখখানি তোলা, চোখ দুটি নিম্নসম্বন্ধ,—শান্তশ্রীটুকু মুখের ওপর টল্ টল্ কচ্ছিল। আমি ভাবছিলুম একি,—এর মানে কি ?

মিনিট খানেক পরে বল্লুম “আচ্ছা পরীক্ষা পর্য্যন্ত থাক্‌বো,” তারপর যে কয়দিন ছিলুম রোজই একটা না একটা নতুন অনুভূতি মনের পাতে নিয়ে বাড়ী ফিরতুম। আমার কথায় সে চা ছাড়্‌লে, জুতো ছাড়্‌লে, বিলেতী সুতোর কাপড় পরা ছাড়্‌লে,—হঠাৎ একদিন শুন্‌লুম হাতভরা যে জড়োয়া গয়না আর গলায় নেক্‌লেস্ ছিল তা-ও সে তিলক-স্বরাজ্যভাণ্ডারে দান করেছে। অথচ এসব বিষয়ে মুখ ফুটে কোন কথা তাকে কোন দিন বলিনি যে তাকে তা' করতে হবে,—শুধু কথায় কথায় বলেছিলুম হয়তো যে আমার বাংলার মেয়েদের এম্‌নি হলেই ভালো লাগে। কথা উঠ্‌তেই সে সব কথার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করতে ছাড়েনি,—কিন্তু তার পর দিনই দেখ্‌তুম তার দেহ থেকে সভ্যতার আবর্জ্জনা একে একে খ'সে যাচ্ছে যার

অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তার আগের দিনই সে আমার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ তর্কজাল সৃষ্টি করেছে। একে তুমি কি বলতে চাও?—এই যে কোথাকার কে আমার ইচ্ছামাত্র আজন্ম-সুখবিলাসলালিতা ধনী দুলালী নিজের জীবনটাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবার প্রয়াস পেয়েছিল, এর এমন কিছু মানে যদি আমি ঠাউরিয়েই থাকি তবে কি তুমি আমাকে পাগল বলতে চাও?" এই বলে সুপ্রিয় একবার চুপ করলে। তখন জলের জোর বেড়েছে, বারান্দায় ঝাপ্টা আসছিল। আমি তার আপনাহারা ভাবটাকে সম্বিৎ করে বল্লুম "ভেতরে গিয়ে বসি ভাই চল, জলের ছাট আসছে"—ভেতরে গিয়ে বসে সে কিছুক্ষণ পরে আবার সুরু করলে! "অত সব বলে আর কি হবে। এবার শেষ সাক্ষাতের পালাটা বলি। সে দিন সে শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, কথা ছিল সেই দিন থেকে আমার কর্ম্মে ইস্তফা। কিন্তু এ চাকরী ছাড়ার কল্পনায় কী যে মর্ম্মন্তুদ মুক্তির বেদনা—যাক্। সে দিনও ঢুকে দেখি নন্দিতা পড়ার ঘরে আগেই এসেছে। 'বসুন' বলে সে চেয়ারখানা সরিয়ে দিলে। আমি আওয়াজে যথাসাধ্য সরলতা টেনে এনে "আজকের পরীক্ষা কেমন দিলেন? পাশের খাওয়াটা কবে?"

"ভালো নয়—পাশ হলে খাওয়া অবশ্যই পাবেন"—

'আপনি রোজই পরীক্ষা দিয়ে এসে বল্‌ছেন ভালো নয়।—কাল বল্লুম প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে একটু discuss করি,

তাও আপনি করতে নারাজ”—“পরীক্ষায় যে ফেল হবো তা’তো জানাই, যদিও বা উৎরে যায়, কোনো মতে তো তৃতীয় বিভাগে, তার আবার **discussion** করবো কি? “কেন?” —“এ ‘কেন’র একটাই মাত্র জবাব হতে পারে, পরীক্ষার পড়া না হলে লোকে পাশ করে কি করে?”

“পরীক্ষার পড়া করেন নি মানে?” মৃদুকণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলুম।

‘মানে,—করিনি, পরীক্ষার বাবদ পড়া করতে আমার ভারী বিরক্ত লাগে”—একটু থেমে আবার সে বল্লে “আমিও বুঝিনে পরীক্ষা পাশ করে দুটো চারটে ডিগ্রী নিয়ে কি লাভ আছে, বিশেষতঃ আমাদের—মেয়েমানুষের, যাদের অন্তঃপুরই বিশেষ কর্ম্মস্থল। শিক্ষা?—তা পরীক্ষার নোট মুখস্থ করার চাইতে কোনো সুযোগ্য শিক্ষকের কাছে,—যেমন আপনি—যদি সারাজীবনও পড়তে পারি তাতেই অতি উপভোগ্য শিক্ষা হয় আমার বিশ্বাস” আমি ভাবছিলুম—একি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত? আমি বল্লুম “তা আপনাদের তো পয়সা আছে সুযোগ্য শিক্ষক রাখতে আপনার বাধা কি?”

“আপনি পড়াবেন?—বলে সে যেন নেহাৎ জোর করে আমার মুখের দিকে একবার চাইলে,—তার পর মাথা নামিয়ে আবার বল্লে “না তা আপনি তো আজই ছেড়ে যাচ্ছেন,—তা ছাড়া আজ থাকলেও চিরদিন পড়াতেন বা কি করে?”

আমি চুপ করে রইলুম। আমার বুকের ভেতরে তখন কি হচ্ছে মুখে বলা চলে না। খানিকক্ষণ পরে সেই আবার বল্লে "বাবা যদি না রাগতেন তবে non-co-operate করে কলেজ ছেড়ে দিতুম"—আমি আমার তরফ থেকে এই বিষম নীরবতাটাকে অবসান করবার একটা ছুতো পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লুম "আপনি সেদিনই না non-co-opeiation এর কথা উঠতে এর বিরুদ্ধে বিষম লড়্‌ছিলেন এবং বাবার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আমি কলেজ ছাড়্‌তে পারিনি বলে কলেজ না ছাড়্‌তে পারাটা আমার পক্ষে দৈবের অনুগ্রহ বলে বলেছিলেন ?"

"যা বলেছিলুম তাই যে আমার মত আপনাকে কে বল্ল ?" "আপনি কি ঝগড়া করেন নিজের মতের বিপক্ষে ?"

"অর্থাৎ ?"—"অর্থাৎ সেদিন যেমন হিন্দুসমাজের কথা উঠ্‌তেই ভয়ানকভাবে জাতিভেদের সমর্থন কচ্ছিলেন ?" নন্দিতা আমার গূঢ় অর্থটুকু বুঝ্‌ল কি না জানিনে, সে বল্লে "হতেও পারে ; তর্কে তর্ক করিবার জন্য একটা দিক নিলেই সেটা যে তার ব্যক্তিগত মত তা নিঃসংশয়ে বলা চলে না।"

"Non-co-operate করলে কি বাবা আপনাকে তাড়িয়ে দেবেন ?—ছেলেকে বরং পারেন মেয়েকে আর কোনো বাপ তেম্‌নি বাড়ীর বের করে দিতে পারে না, তা তিনি হাজার রায় বাহাদুরই হন—"

তা বাবা পারেন তিনি কি রকম কড়ালোক আপনি জানেন না; আমার একমাত্র পিশিমা,—বি-এ, পাশ করার পর এক কায়স্থ ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন বলে তাঁর মুখ দর্শন পর্য্যন্ত তিনি করেন না,—সেদিন আমি এই বিয়ের আলোচনায় তাঁর দিকে টেনে কি একটা কথা বল্‌ছিলুম, তিনি এমন এক ধমক দিলেন যে কি বোল্‌বো।" একটু থেমে সে চোখ দুটি আমার পানে পেতে বল্লে "জানেন আমি তো মা-মরা মেয়ে, তার পর বাবা আবার বিয়ে করেছেন,—আমাকে তাড়ানো বিশেষ একটা শক্ত কথা কিছুই নয়, আর তাড়ালে যে আমি চল্‌তে না পারি তাও নয়,—দরিদ্রভাবে চলা আমার মোটেই শক্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস নয়—পঞ্চাশ টাকায় আমি একটা সংসার চালিয়ে নিতে পারি—কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই এ কথা আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারিনে আমি মেয়েমানুষ, পুরুষের আশ্রয় আমাদের নেহাতই দরকার,—কে আমায় আশ্রয় দেবে?"—একটু মুচ্‌কি হেসে সে বল্লে "আপনি দেবেন?" সে যেন সে দিন মরিয়া হয়ে কথা বলে যাচ্ছিল। তখন দ্বিধা সংশয় আমার সব চলে গিয়েছে, বুঝলুম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ কথার মাত্র একই অর্থ হতে পারে। অননুভূত একটা আনন্দের বন্যায় যেন আমার সর্ব্বদেহ অবশ করে আন্‌ছিল। কি করে যে তখন সংযত হয়েছিলুম, কি করে যে তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে পাগল করে দিই নি সেটা আমার

সময়ে সময়ে আশ্চর্য্যই বোধ হয়। কিন্তু এই অভূতপূর্ব্ব উন্মাদ উদ্বেলতার সঙ্গে ছিল মিশ্রিত একটা বিজয়ের অপূর্ব্ব গর্ব্ব। পরোক্ষভাবে সঙ্কোচের খাতিরে আর এই অহঙ্কারের জোরেই বোধ হয় আমি নিথর প্রতিমার মতো বসেছিলুম। কি বইতে যেন পড়েছি একশ্রেণীর প্রেমিক আছে যারা প্রেম-পাত্রীকে বেদনা দিয়ে একটা উৎকট আনন্দ পায়,—কথাটা সত্যি, বুঝলে সতীশ,—কথাটা অতি সত্যি। আমি হঠাৎ নিথর দেহখানাকে আরো শক্ত কাঠ করে মুখে পাথরের দৃঢ়তা এনে বিদ্রূপের স্বরে বলে ফেল্লুম "দেখুন আপনার একথার Solution আমি দিতে পারিনে,—কিন্তু আপনাকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার, যে আপনি অনেকগুলো কথা বলেন—হয়তো না বুঝে—যার অর্থ অনেক সময় সন্দেহজনক হতে পারে, এবং তার অসদর্থ যদি কেউ করে তাকে দোষ দেওয়া চলে না।"

পূর্ণিমার রাতে চাঁদের ওপরে কালো একটা মেঘের খণ্ড দম্‌কা হাওয়ায় উড়ে এলে আকাশ বাতাস যেমন থম্‌থমে শঙ্কাকুল অন্ধকারে ভরে আসে, তার চোখে মুখে এই কথা শুনে মুহূর্ত্তে তেমনি একটা আঁধার ঘিরে এলো। সে অভিভূতের মতো একটু পরে বল্লে "দেখুন, আমি সব জানি, সব বুঝি, কিন্তু আমি বড় বোকা,—আমার সাহস নেই, আমার—" সে থেমে গেল। মিনিট তিনচার দু'জনেই স্তব্ধ বসে রইলাম,

শুধু দেয়ালে ঘড়িটার টক্‌টক্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কত কথাই মনের মাঝ থেকে আকুলি বিকুলি কচ্ছিল ছাড়া পাবার জন্যে, কিন্তু কে যেন আমার গলা চেপে ধরেছিল। কিছুই বলা হোলো না। অবশেষে অতি কষ্টে বল্‌তে পাল্লুম শুধু "আসি তবে"—"আসুন"—সে মাথা আর তুল্‌লে না। আমি মিনিট খানেক আরো ছাতাটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপরে অসহায়ের মতো ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলুম।

রাস্তায় যেতে যেতে আমার মনে হোলো প্রথমদিন তার কাছ থেকে একটা প্রণাম পেয়েছিলুম,—আজ পাইনি। প্রণামের যোগ্যতাটা তার কাছ থেকে কি হারিয়েছি? নন্দিতা একদিন বলেছিল যে অপূর্ব্ববেশে বর্ষাসিক্ত হয়ে অপরিচিত তাদের সাম্‌নে প্রথমদিন গিয়ে নিঃসঙ্কোচ চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলুম তাই নাকি তার একটা বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। সে কথাটা মনে পড়্‌ল। আজ খতিয়ে দেখলুম বেশের পারিপাট্য আমার অজ্ঞাতভাবেই যেন কোন দিক দিয়ে কতখানি বেড়ে উঠেছে,—আর এও মনে পড়্‌ল নন্দিতার বেশই বা পারিপাট্যের কোন শিখর থেকে সাদা-সিধার কোন ধাপে এসে নেমেছে! মনে মনে একবার প্রশ্ন কর্‌লুম হঠাৎ এ কথাটা আমার মনে যেমন জাগ্‌ল নন্দিতার মনেও তা' জেগেছে কিনা এবং মনে পড়ে' ওষ্ঠে বিদ্রূপের রেখা ফুটিয়ে তুলেছে কি না। কিন্তু তখনই সুপ্ত অহঙ্কার মাথা তুলে বল্লে কেন—আখেরীর শক্তিশেলটা তো

তাচ্ছিল্যভরে আমিই মেরে এলুম। দেখুক সে চরিত্রের দৃঢ়তাটা আমার কত বড়। কিন্তু হায়রে অন্ধ অহঙ্কার?—এ তুচ্ছ আত্মাভিমান কতক্ষণ ছিল? তারপর দিনের পর দিন যখন একঘেয়ে মুহূর্ত্তগুলা নিরানন্দের পসরা নিয়ে আমার অন্তরের দুর্ব্বহ ভারকে আরও নিবিড় করে তুল্‌ত, নিজের জ্বালা আগুনে নিজেই পুড়ে খাক্ হতুম তখন এক একদিন মনে হোতো ছুটে তাদের বাড়ীতে গিয়ে একটীবার মাপ চেয়ে আসি। কতদিন যাবো ব'লে বেরিয়েওছি, কিন্তু বড় জোর তাদের বাড়ীর রাস্তার মোড় থেকে অবাধ্য পা কতদিন আর এক নতুন রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে গেছে।

অবশেষে এক চিঠি তাকে দিলুম নিজের মনকে অনেক চোখ ঠেরে নিজের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে যে কেন—আমি কোন্ সাহসে কোন্ ন্যায়ে তাকে এম্‌নি বিষম আঘাত করে মাপ না চেয়ে থাক্‌তে পারি। আর এখানে মাপ চাওয়াই উদারতা, যদিও এটাকে পরাজয়ের একটা অধ্যায় বলেই আপাততঃ মনে হয়। তার প্রতি যেন করুণা করেই চিঠিতে এই শুধু লিখ্‌লুম সে যেন কোনো দোষ হয়ে থাক্‌লে আমায় মাপ করে, আর পরীক্ষার ফল বেরুলে যেন নিমন্ত্রণটার কথা তার স্মরণ থাকে। কিন্তু তাকে করুণা কর্‌তে গিয়ে নিজেকে যে কতখানি করুণা করে ফেল্লুম, তা জান্‌তে পার্‌লুম তখন যখন চিঠিটা ডাকবাক্সে ছেড়ে দিইছি। পরাজয়েও এমন অপার আনন্দ আছে তা আগে জান্‌তুম না।

চিঠির জবাব এলো না ।

আরো একমাস গেল, শুনলুম তারা শিলং চলে গিয়েছে চেঞ্জে । বুকে যে তুষের আগুণ জলছিল তা নেবাবার কোনো উপায় ঠাওরাতে না পেরে আর একখানা চিঠি তাকে দেবো ভাবলুম । কিন্তু কোন্ অজুহাতে ? অনেক ভেবে চিন্তে মনে পোলো তার কাছে আমার নিজের অনেকগুলি বৈ ও নোট আছে, তারই একখানা দরকার বলে চেয়ে পাঠাই । মাত্র একখানা বৈ চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানালুম তার এপর্য্যন্ত একখানা চিঠিও না পেয়ে নেহাত মর্ম্মাহত হয়েছি । হয়তো চিঠিখানা একটু অনাবশ্যক লম্বা হয়ে গেল । আমার বুভুক্ষু আগ্রহের জবাবে এল এই দুটী লাইন—বলে সুপ্রিয় পকেট থেকে একটা রূপার চওড়া কেস্ বের করে রেশমের রুমাল দিয়ে মোড়া একখানা সাদা খামে পোরা চিঠি বের করে আমার হাতে বাড়িয়ে দিলে । তাতে লেখা আছে—

শিলং,
আটাশে মে ।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার বৈ এতদিন পাঠান উচিত ছিল । কিন্তু আমার স্মরণ ছিল না । আশা করি অসতর্কতাজাত এ ত্রুটি মাপ করবেন । ইতি—

বিনীতা শ্রীনন্দিতা সেনগুপ্তা ।

চিঠিটা রুমালে জড়িয়ে বাক্সে বন্ধ করতে করতে আবার সুপ্রিয় বলতে লাগল "এই-ই তাহার প্রথম এবং শেষ চিঠি। এখানি আমার আঁধার হৃদয়ে ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার আকাশে বিদ্যুৎরেখার মতো মাঝে মাঝে আলোর খেলা দেখায়। যাক্। এর তিন চার দিন পরে একটা পার্শেল এলো, তাতে সবগুলা বৈ-ই সে পাঠিয়েছে,—মায় আমার হাতের লেখা নোটগুলি পর্য্যন্ত,—কোনো চিঠি পত্র তাতে নেই। সেদিন যে কিরকম রাগ হয়েছিল বলতে পারি নে। ভাবতে ভাবতে শেষে শুধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে এই-ই আমার উপযুক্ত শাস্তি।

তার পর ফল বেরুল। প্রথম বিভাগে সে পাশ করেছিল। আনন্দে শিলঙে একটা **telegram** করে দিলুম—একটা চিঠিও দিলুম আগ্রহ অভিনন্দনের। জবাব এলো না।

এমন সময় বাবা একদিন বল্লেন আমার বিয়ে হওয়া আবশ্যক, একটী পাত্রী নাকি দেখে এসেছেন তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে, শুধু এখন আমার মতের অপেক্ষা। উত্তরে স্পষ্ট জবাব দিলুম উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করা আমার অসাধ্য। বাবা একটু দুঃখিত হলেন—মা চোখের জল ফেল্লেন, কিন্তু আমার উপায় ছিল না।

কিছু দিন পরে একদিন কলেজে নন্দিতার ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "সুপ্রিয়বাবু,—বিয়ের নিমন্তন্নটা থেকে বাদ

পড়িনে যেন”—আমি স্বরের বিরক্তিটা যথা সাধ্য চেপে জিজ্ঞাসা করলুম “এ সুসংবাদটী কোত্থেকে পেলেন ?”

“এই যে সুরেশ বল্লে—” “ও সব বাজে কথায় কান দেবেন না”—বলে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেলুম। ভাবতে লাগলুম নন্দিতার কানেও এ কথাটা পৌছেচে কিনা !

সপ্তাহ তিনেক পরে—শুন্‌লুম নন্দিতা বি-এ, ক্লাশে বেথুনে ভর্ত্তি হয়েছে। মনে সেদিন বড্ড লাগ্‌লো নেমন্তন্ন করা দূরে থাকুক পুরানো শিক্ষকের সঙ্গে পরীক্ষায় সফলতার পরেও কি শুধু একবার দেখা করার মতো ঔৎসুক্যও তার হোলো না !—না এ নিক্তির মাপে প্রতিশোধ ! তার তো কম হয় নি, রক্তমাংসের বুকে শুধু দগ্ধ অঙ্গারের কৃষ্ণতাই ফুটে উঠতে বাকী আছে।

আর একখানা চিঠি তাকে দিলুম, প্রত্যেক অক্ষরের পর বক্ষ নিংড়ান ভালবাসা দিয়ে, ছত্রে ছত্রে তার রক্তরাঙা উন্মত্ততার প্রক্ষেপ দিয়ে। আখরের ভিতর দিয়ে কি তার প্রাণে গিয়ে তার রেশ পৌঁছাবে না ? লিখ্‌লুম তাকে একবার দেখতে আমার ভারী সাধ যায়, শুধু এই কথা আর কিছু না,—পত্র পাঠ যেন সে জবাব দেয়।

জবাব এলো না। এক দিন গেল দু’দিন গেল তিনদিন গেল।

আমি ক্ষেপে উঠ্‌লুম। এই বুঝি সে আমাকে ভালোবাসতো ? আমার এত আকুল আহ্বান সে উপেক্ষা তা হলে করে কি করে।

সব ভূয়ো সব ছায়া বাজি। আমায় সে কোনদিন ভালোবাসে নি। আমার চিঠিগুলা হয়তো তার বিদ্রূপের খোরাক যোগাচ্ছে! ওঃ অসহ্য!

সেই দিন গিয়ে মাকে বল্লুম আমি বিয়ে করবো। দেখুক সে,—তাকে ছাড়াও আমার দিন কাটতে পারে।

আত্মীয় স্বজনেরা হাস্‌লে এই বুঝি আমার উপার্জ্জনক্ষম হয়ে বিয়ে করা!

দিন পনেরো পরে বিয়ের তারিখ ঠিক হোলো। দুশ্চরিত্র মদ্যপ পুত্র নির্দ্দয় প্রহারে বুড়ো বাপকে জখম করে নেশা ভাঙ্গলে আহত পিতার পানে চাইলে তার যেমন অবস্থা হয়, বিয়ের আগের দিন রাতে আমার সেই অবস্থা হোলো। দেখলুম এ বিয়ে করা আমার অসাধ্য, মহাপাপ। প্রতিশোধ গ্রহণচ্ছলে অদ্ভুত খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে এ আমি কী করিতে যাচ্ছি? বৌকে ভালবাসা আমার অসম্ভব,—তবে তার তরুণী জীবনের সমস্ত মাধুর্য্যটুকুকে এম্‌নি করে দলে পিশে মারবার আমার কি অধিকার আছে? ভোর বেলা পালালুম।........ তার পর কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো এই চার বছর ঘুরেছি—কিন্তু বুঝলে সতীশ, কোথাও শান্তি পাই নে। সুদূর বিদেশে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্ব্বতের শিখরে, দগ্ধ মরুভূমিতে শুধু এক মর্ম্মদাহী স্মৃতি, এক পোড়াণি এক জ্বালা।

দিন কুড়ি হোলো বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা কিন্তু আশীর্ব্বাদই করলেন। মা বাবা দেবতা তাই হয়তো এমন

লক্ষ্মীছাড়াকেও তাঁরা আশীর্ব্বাদ করতে পারলেন। বাড়ীতে শুনলুম যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল সে বিয়ের রাতে বাপের মনস্তাপ সইতে না পেরে বিষ খেয়ে মরে। মেয়েটীর নাকি বাপের পয়সা নাই বলে বিয়ে হচ্ছিল না। অবশেষে বাবা মেয়েটীর চেহারা দেখেই তারপর বাপের দুর্দ্দশা দেখে দয়া করে তাঁর সতেরো বছরের মেয়েকেই পুত্রবধূ করতে মনঃস্থ করেছিলেন। তোমাকে তো আগেই বলেছি বাবা মা দেবতা। কি দাগা পেয়ে বাপ মার কোল ছেড়ে পালিয়েছিলুম তা তাঁদের আভাসে বলেছি। তাঁরা বল্লেন কি জানো ? আমি তাকেই কেন বিয়ে কল্লুম না, তাঁদের তাতে কোন আপত্তি ছিল না—আর এখনও যদি সম্ভব হয়...............আমি বললুম তা হয় না।............এমনি ভবিতব্যতা !

কেমন শুনলে বন্ধু আমার গল্প,—যার পরিসমাপ্তি হোলো নির্দ্দোষ বালিকার রক্ততর্পণে ! তার মৃত্যুর জন্য সাক্ষাৎ ভাবে আমি দায়ী না হলেও ওর স্মৃতির বিভীষিকার হাত থেকে এড়াতে পারি কৈ ? আচ্ছা বলতে পারো আমাকে কেন্দ্র করে বিধাতাপুরুষ এমন একটা নিষ্ঠুর খেলা খেললেন কেন ?” সে চুপ করলে। অমি বল্লুম তাই যদি পারবো ভাই তবে এ বিধাতা-পুরুষের আর এক নাম অদৃষ্ট হবে কেন ? সে চুপ করেই রইল। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম “জানো বোধহয় নন্দিতা সেনগুপ্তা নারী-শিক্ষা-সমিতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী,

লোকের মুখে তাঁর সুনাম ধরে না, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে স্ত্রীলোকদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে যেমন অদম্য চেষ্টা করে বেড়াচ্ছেন তাতে আশ্চর্য্য হতে হয়। তিনি নাকি চিরকুমারী থেকে দেশ সেবাতেই আত্মনিয়োগ করবেন।"

"জানি"—

"একবার দেখা করলে পারো না"—"কে—আমি ?—অসম্ভব। যে আমি আত্মাভিমানের চরমশিখরে দাঁড়িয়ে সগৌরবে তাকে হারিয়েছি,—এ অর্দ্ধমৃত অপদার্থ অস্তিত্ব বয়ে নিয়ে আর সামনে যেতে চাই নে। আমার এ ব্যর্থ জীবনটা তার জীবনে যদি কিছু রং ধরিয়েও দিয়ে থাকে, তবে তার কর্ম্ম প্রাণতার ভেতর দিয়েই এর যতটুকু সার্থকতা হয় হোক্। আমি দুনিয়ার পক্ষে এখন অনাবশ্যকের মধ্যে,—আমার মনে হয় আমার সমস্ত কর্ম্মক্ষমতা লোপ পেয়েছে। যাক্ গে—কটা বাজলো ?"

সে দেয়ালের ঘড়িটার পানে চাহিল, পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে খোলা জান্‌লা দিয়ে বাহিরের পানে তাকিয়ে রইল। তার শুষ্ক শীর্ণ মুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমার বুক ব্যথায় ভরে উঠল।

"মার্জ্জারগমনে শুদ্ধিঃ"

মহারাজ চক্রবর্ত্তীর ব্যাটার বিয়ের নেমন্তন্ন। বামুন পণ্ডিতেরা খেতে বসেছেন। ভাটপাড়া নবদ্বীপ থেকে আরম্ভ করে নারাণপুর, কাঞ্চনপুর, কামরূপ—সারা রাজ্যি বেরাজ্যির য-ত পণ্ডিত কেউ বাদ যান নি। রুই কাৎলা থেকে চুনপুটি সবই আছেন।—কেউ পণ্ডিত বেদের, কেউ তর্কশাস্ত্রের, কেউ সাংখ্যের, কেউ বা ন্যায়ের, কেউ স্মৃতির, কেউ ব্যাকরণের, কেউ কাব্য কলার।

প্রকাণ্ড উঠান। নীলরংএর চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। তারি নীচে বামুনদের পাতপীড়ি।

সার সার বামুন পণ্ডিতেরা বসেছেন। সবারি মুড়ানো মাথায় হাজার আটগাছি চুলের মোটা টিকি; বা কাঁধ থেকে ডান কোমরে নেতিয়ে পড়েছে ধব্‌ধবে ফর্সা পৈতে,—তা গঁদের আঠার কলপ দেওয়া—শক্ত টৌন সূতার মতো।.........দিব্যি ব্যাজ্!

রূপার গাম্‌লায় সোনার হাতায় প্রথম প্রস্থ পরিবেশন হয়ে গেল।

বৈদিক মহামহোপাধ্যায় স্মিত দৃষ্টিতে সতীর্থবর্গের পানে তাকিয়ে বল্লেন "হেঁ—হেঁ—হেঁ—এবার তাহ'লে—"

সবাই বল্লেন "হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বেশ ;"

সকলে গণ্ডূষ নেবার জল হাতে নিলেন।

মার্জ্জারগমনে শুদ্ধিঃ ?

"নাগায় নমঃ, কুর্ম্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ—"

—"বাবাগো, মলুম গো, ধর্‌লেরে—" চেঁচাতে চেঁচাতে মালীর ছোট ছেলেটা এক্কেবারে ছুটে চাঁদোয়ার নীচে !

"হাঁ হাঁ হাঁ !! কে—কি—ব্যাপার কি ?"

মালীর ছেলে দেউড়ীতে বসেছিল। একটা ক্ষ্যাপা কুকুর তাড়া করায় পালিয়ে এসেছে। বারো বছরের ছেলে সে। ভারী সুন্দর ফুট্‌ফুটে দেখ্‌তে।

সভায় হুঙ্কার উঠ্‌ল "কি-অনাচার !"

"কি ব্যাভিচার !"

হাজার পণ্ডিতের দুহাজার চোখ তার পানে কট্‌মট্‌ করে চাইলে। ছেলেটার মুখটুকু টোস্ট করা পাঁউরুটীর মতো শুকিয়ে গেল !

ভাগ্যে সত্যিযুগ নেই,—নয়তো বা হাজার জোড়া চোক থেকে ঠিক্‌রে-পড়া আগুনে ছোক্‌রা ছাই হয়ে যেতো !

"অর্ব্বাচীন—"

"বেল্লিক—"

"বেহায়া—"

"বেয়াদব—"

"অকাল কুষ্মাণ্ড—"

কাব্যবিশারদ এরপর অনুপ্রাসের জাঁক দেখিয়ে মিহিকণ্ঠে হাঁকলেন,— "লণ্ডভণ্ড—"

বিষম ব্যাপার। স্মৃতিরত্ন তখন "মহাভারত, মহাভারত" আউড়ে সবটুকু অপবিত্রতা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। ঝুলে পড়া পৈতে অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জ্জনীর সাহায্যে ডান কাঁধের ওপর ছুড়ে ফেলে, শিখাবন্ধ পুষ্পগুচ্ছে প্রকাণ্ড একটা দোলা দিয়ে সবাই আসনের ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

সর্ব্বনাশ—ব্রাহ্মণ-ভোজন বুঝি পণ্ড হয়!

মহারাজ চক্রবর্ত্তী গললগ্নীকৃতবাসে মিনতি জানালেন সমস্ত ত্রুটি তাঁর। নিজগুণে যদি তারা.........

"কি অনাচার—"

"কি ব্যাভিচার —"

"কি অবিচার—"

"কি অত্যাচার—"

"কি বেবন্দোবস্ত—"

রাজা নিরুপায় হয়ে পায়ে পড়্লেন। কোনোরকমে বামুনেরা কিছু ঠাণ্ডা হলেন।

তখন রসুইঘর থেকে দাদখানি চালের পোলাওর গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছিল।

ন্যায় চুঞ্চু শাসালেন "খবরদার,—এবার যেন সুবন্দোবস্ত হয়!"

সবাই হাঁক্লেন "নিশ্চয় নিশ্চয়।"

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকা ছেলেটাকে টুটি ধরে আল্‌গা করে দেউড়ী পার করে দিয়ে আসা হোলো। এই গেল সুবন্দোবস্তের পয়লা জের। "অব্যাপারেষু ব্যাপারঃ" করবার পরিণাম দেখে পণ্ডিতেরা আশ্বস্ত হলেন।

আঙ্গিনায় গোবরজলের ভাগীরথী বয়ে গেল। ফের পাত-পীড়ি পড়লো।

উঠানের চার কোণায় এবার দাঁড়াল চারজনা করে বরকন্দাজ, তাদের হাতে চারহাতি তেল-পাকানো বাঁশের লাঠি।

ঘন ঘন "দীয়তাং ভুজ্যতাং" আওয়াজের ভেতরে দক্ষিণ-হস্তের কাজ চল্‌ছে। তখন পাতে দই।

—"হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ—"

হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড ধব্‌ধবে সাদা ল্যাজ-মোটা বেড়াল পূবকোণা থেকে এসে মাঝখান দিয়ে ছুট্। পূবকোণার মোতায়েন সেপাই রামলক্ষ্মণ পাঁড়ের পাকা বাঁশের লাঠি "দড়াম্" করে মাটীতে পড়ে খানিকটা মাটী খুঁড়ে ফেল্লে। ততক্ষণে মার্জ্জার পুঙ্গব একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে বৈদান্তিকের মাথা টপ্‌কে, বৈয়াকরণিকের বাঁ পাটাতে একটু আঁচড়ে, বেদাধ্যায়ীর চাদরটা ছিঁড়ে, কাব্যবিশারদের গা ঘেষে মাঝখানে গিয়ে পৌঁছেচে। বেড়ালটার মুখে আধ খেকো একটা পিঠে। শেষমেশে সেটার ধাক্কা লেগে ন্যায়চুঞ্চু মশাইর গেলাসটা কাত হয়ে পোড়লো।

রাজার মুখ শুকিয়ে গেল ব্রাহ্মণেরা বুঝি অভুক্ত ওঠেন।

সান্ত্রীদের বুক শুকিয়ে উঠ্‌ল এবার বুঝি গর্দ্দান যায়।

ন্যায়চুঞ্চু চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "দেখ্‌লে, দেখ্‌লে কোত্থেকে এলো এঁটো মুখো বেড়ালটা!—ওহে স্মৃতিরত্ন—বলতো—"

স্মৃতির পণ্ডিত সড়াৎকরে খানিকটা দৈ উদরস্থ করে মুরুব্বিয়ানা চালে বল্লেন "আরে খাও না হে-- বেড়াল গ্যাছে তার কী হয়েছে,—মার্জ্জারগমনে শুদ্ধিঃ—"

সবাই বল্লে "হাঁ হাঁ বটেইত বটেই তো।"

রাজার ঠোঁট চিরে হাসির রেখা ফুট্‌ল।

সেপাইদের ধড়ে প্রাণ এলো।

এবার একটু মুচ্‌কি হেসে ভুরূ কুঁচ্‌কে স্মৃতিরত্ন কাৎহয়ে পড়া গেলাসটার পানে চেয়ে বল্লেন "কিন্তু ন্যায়চুঞ্চু আর বিদ্যাবাগীশ দুজনাই কিন্তু খুব বেঁচেছ হে, ঐ ত্থাখো তোমার এঁটো জলের ধারাটা এক আঙ্গুলের জন্যে বিদ্যাবাগীশের আসনটা ছুঁয়ে যায় নি।"

"সত্যিই তো, সত্যিই তো"—বিদ্যাবাগীশ ছড়িয়ে পড়া কোঁচার শেষটা সন্তর্পণে গুটিয়ে নিলেন।

বেড়ালটা ততক্ষণে পশ্চিম কোণে সাংখ্যরত্নের ডানপাশে বসে পিঠেখানার সদ্ব্যবহার কচ্ছে। সেটার পানে চেয়ে তিনি বল্লেন "কিন্তু যাই বল, খাসা বেড়ালটা দেখ্‌তে!"

মহারাজ স্মিতহাস্যে হাতজোড় করে নিবেদন করলেন "আজ্ঞে হ্যাঁ ওটা আমার ছোট মেয়ে অপর্ণার বেড়াল। দেখ্‌তে সুন্দর

কিন্তু ভা—রী দুষ্টু। এই যে বাইরের উঠানে মেথরাণীর মেয়েটা খেতে বসেছে তার চক্ষের সাম্‌নে পাত থেকে পিঠেখানা নিয়েই ছুট্।·········ওরে হরে, ঠাকুরমশাইদের দৈ হয়ে গিয়েচে, সন্দেশ নিয়ে আয়, শীগগির সন্দেশ নিয়ে আয়।”

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

(১)

নীলা বল্‌ত ও আমার বন্ধু।

এক বাদল সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। রেল গাড়ীর এক বেঞ্চিতে বসে দু'টি ভাই বোনে খুনসুটি সুরু ক'রে দিলে। ভাইটিকে আগে থেকে জানতুম, তাইতে ওকেও জানতুম।

প্রায়ই মনে পড়ে ওদের ভাই বোনের সেই মধুর ঝগড়াটি। আর কোঁদলের ফাঁকে ফাঁকে নীলার আধ ঘুমন্ত চাহনিটি বৃষ্টির ধোঁয়াটে ধারা পেরিয়ে যেন কোন্ সুদূরের পিয়াসী হয়ে চক্রবালরেখায় লুটিয়ে পড়ছিল!

নীলা কালো মেয়ে, তবু কি সুন্দর! কালো যে তাতেও ওর লজ্জা নেই; সুন্দরী যে তাতেও অভিমান নেই।

কী-ই বা কথা হোলো পথে—দু'টো পাঁচটা যা, তা'। মোগল সরাইতে নেমে ওরা হরিদ্বার চলে গেল, আমি চল্লুম এলাহাবাদ।

প্রায়ই মনে পড়ে সেই ভাইবোনের কোঁদল, বাদল সন্ধ্যা, কালো রং, সেই সুদূরের চাহনি। যেন ছবি!

খেয়াল হোলো,—হঠাৎ একদিন নীলাকে চিঠি দিলুম—"আমি অকেজো, তাই অকাজের চিঠি লিখছি। আমায় মনে আছে কি? আপনার ভাইয়ের বন্ধু? নির্জন প্রবাসে চিঠি পাবার লোভেই এ চিঠি।" নীলা মেয়ে-স্কুলের মাষ্টার।

জবাব এলো, "মনে আছে। ভাইয়ের বন্ধু তো বন্ধুই হয়।"—সেই থেকে আমি ওর বন্ধু। সেই থেকে কত চিঠি লিখলে ও ছেলেমানুষীতে ভরা,—কবে কোন্ পাগলী এসে ওর শাড়ী চুরি করে সারা সহর ঘুরে বেড়ালে, তা পর্য্যন্ত।

একদিন নিস্তব্ধ রাত্রে নীলাকে চিঠি লিখছি। পাশের বাড়ীতে একটা মাদ্রাজী মেয়ে হার্ম্মোনিয়াম নিয়ে এন্তার বেসুরা চ্যাঁচাচ্চে। এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে জল এলো। ওকে লিখে ফেল্লুম—"প্রায়ই মনে পড়ে সেই ভাইবোনের কোঁদল, বাদল সন্ধ্যা, কালো রং, সেই সুদূরের চাহনি। যেন ছবি।" হঠাৎ ভাবলুম আমার চিঠিগুলো ও আর কাউকে দেখায় না তো?—পড়তে পড়তে কেউ এলে ওর সুরভি আঁচলের নীচে ত্রস্তে ঢেকে ফেলে তো? আমি যে ওর বন্ধু;—আমি আর আর-সবাই কি সমান হয়?

নীলার জবাব পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। লিখেচে—"আপনার লেখার ছাঁদ আমার ভালো লাগছে না—চিঠি আমায় লিখবেন না।"

তথাস্তু। হাসি পেল—'বন্ধু'! কী বোকা মেয়ে,—কিছু বোঝে না। কিন্তু ও সুন্দর—সেই কালো রং, সেই সুদূরের চাহনি—যেন ছবি। সে ছবি চিরজীবী হয়ে আমার বুকে থাক।

(২)

একটা নতুন চাকরী নিয়ে মাস দু'এক হোলো কাশীতে এসেছি। হঠাৎ একদিন পথে দেখা—নীলা!

"বাঃ আপনি এখানে যে!"—ঠোঁটের কোণায় ওর মৃদু হাসি।

জবাব দিলুম "নয়া নোক্‌রী নিয়ে এসেচি।"

"তা বেশ করেচেন। এই দু'কদম গেলেই আমার বাসা। চা খেয়ে যাবেন চলুন। বেলুকে মনে পড়ে আপনার 'বেলু'? সেই যে সব ছোট ভাইটি আমার 2nd classএ পড়ত? আমার কাছে এখানে থেকেই সে এবার B. A. দিচ্চে হিন্দু ইউনিভারসিটিতে। ছয় বছরের কথা—উঃ আধ যুগ কেটে গেছে,—সেই আমার সঙ্গে দেখা।"

"আপনি কচ্চেন কি?"—সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা কল্লুম। কে জানে ওর বে' হয়েচে কি না? ওদের বাসায় গিয়ে হঠাৎ ওর স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'লে কি রকম কথাবার্ত্তা কইব সেটা আগে

খবরটা জানলে অল্পবিস্তর মনে মনে মহড়া দিয়ে নেওয়া যায়। যে মর‍্যালিষ্ট মেয়ে আর যে ছেলেমানুষী ওর,—কে জানে কী-না-কী সেই চিঠি লেখালেখি নিয়ে তাকে বলে থাকবে!

"কচ্চি আর কি, চিরদিন যা করে থাকি—চাকুরী।" আমি একটু ইতস্ততঃ করে বল্লুম—"আর একদিন না হয় আপনাদের ওখানে যাওয়া যাবে। আমার একটু কাজও—" নীলা আমার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল—কথা শেষ না হ'তেই হি হি করে হেসে বল্লে—"ভয় নেই ভয় নেই চুনীবাবু—নতুন মানুষ বাড়ীতে কেউ নেই। মা, আমি আর বেলু—তিনটিতে এখানে আছি। দাদা, আপনার বন্ধু - কলকাতায় চাকরী করচে।"

মেয়েটার কথায় ও ভঙ্গীতে লজ্জা পেলেও যেতেই হোলো। পথে যেতে যেতে জানলুম বাবা ওদের পাঁচবছর হোলো মারা গেছেন। তিনি একটা হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন।

সেবার নীলার বয়েস দেখেছিলুম একুশ; আজ সাতাশ বছর বয়েসেও তেম্নি আছে, একটুও বদলায় নি।

(৩)

B. A. পাশ করে 'বেলু' বোনের জমানো টাকা দিয়ে ওখানেই একটা ব্যবসা ফেঁদে বস্‌ল। আমার কিন্তু কাশী ছেড়ে পালাতে হ'ল।—নীলা বলে আমায় ও চায়, আমায় নইলে ওর কিছুতেই চল্‌বে না।

আমি বল্লুম, "তা' হয় না।"

ও আমার পায়ের কাছে মাটীতে ব'সে পড়ে সূর্য্যমুখী ফুলের মতো মুখখানি তুলে বল্লে "তোমায় না বুঝে একদিন কটুকথা লিখেছিলুম বলে বুঝি আমায় এ শাস্তি দিচ্চ?" ওর চোখের কোণা থেকে গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁট দু'খানি কেঁপে কেঁপে উঠল।

আমি ওকে তুলে বল্লুম, "তা নয়, নীলা।"

ও মরিয়া হয়ে বল্লে, "তবে, তবে কি আমি তখনকার চাইতে আরো কুচ্ছিত হয়ে গেছি? ভেতরের আমিটা তো তখনো যা ছিল এখনো তাই আছে।"

আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্লুম,—"না, নীলা তুমি আমার চোখে তেমনি সুন্দরই আছ। তোমার সৌন্দর্য্য আমার মনে অমর হয়ে থাক তাই তো তোমায় বে' করতে চাই নে!"

ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আমার মুখে ওর মুখ—অশ্রুসিক্ত মুখ রাখলে। আমার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল। পাৎলা সে ঠোঁটদুটির ছোঁয়ায় কি মত্ততা, ওর স্পন্দমান বুকের নিষ্পেষণে কি জমাট বাঁধা মধু!

কিন্তু তবু পালিয়ে একটা স্কুল মাষ্টারী নিয়ে ফয়জাবাদ চলে গেলুম। নীলা আমার চোখে অপরূপ সুন্দরী হয়েই চিরকাল থাকুক। নিবিড় পরিচয়ের স্পষ্টালোকে টেনে এনে স্বপ্ন-সুন্দরীর রহস্যময় মাধুরিটুকু মাটি করতে চাই না।—তা ছাড়া আমার জীবন—

ওর সেই শ্যামলশ্রী, রহস্যময় চাহনি, প্রথম সন্দর্শনের বাদল সন্ধ্যা, কম্পমান ওষ্ঠ দু'টির স্পর্শ, কোমল বক্ষের স্নেহনিষ্ঠুর নিষ্পেষণ,—আজও আমার চাদরে ওর চুলের গন্ধ—অক্ষয় হয়ে আমার মনে বেঁচে থাক। সাতদিন হলো ফয়জাবাদে এসে একদিন এই সব মনে মনে তোলাপাড়া কচ্চি এমন সময় একখানা গাড়ী এসে আমার বাড়ীর দরোজায় থাম্‌ল।

গাড়ী থেকে নেমে এল নীলা! চক্ষে ওর উৎকট ক্ষিপ্ত চাহনি। দেহ ওর হাল্কা হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো কাঁপচে।—অদ্ভুত মেয়ে এই নীলা!—

ও আমায় কিছুতেই বুঝলে না, কোনো কথা শুনলে না। ওকে বে' না করে আমার উপায় নেই! আমার যত কিছু আপত্তি ও ছেলে মানুষী বলে হেসে উড়িয়ে দিলে।

(৪)

আরও ছ' বছর চলে গেছে। আজ শ্রাবণের পূর্ণিমা। আকাশে খণ্ড খণ্ড পাঁশুটে মেঘের অন্ত নেই। তারই ফাঁকে চাঁদ হাসিমুখ বার করে ফের মুখ ঢাক্‌চে। রাত দুপুর। হঠাৎ ঝম্‌ঝমিয়ে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি এল।

রাতের বাদলধারা আমায় চিরদিন কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ করে ফেলে। হঠাৎ সেই বর্ষারাতের কথা মনে পড়ল, যেদিন নীলাকে উচ্ছ্বসিত চিঠি লিখে ওর ধমক খেয়েছিলুম। চোখে পড়ল নীলা আমার কাছেই ঘুমিয়ে আছে; ওর এক পাশে দুটি

শিশু। ওরা আমার সন্তান। বড় ছেলেটা বিছানার কোণায় প্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে ; মেয়েটাই ছোট ; সেটার আজ দশদিন হ'ল জ্বর। অর্দ্ধনির্ব্বাপিত লণ্ঠনের ক্ষীণালোকে দেখলুম মেয়েটা মাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রে ধুঁকচে। নীলার বসন শ্লথ, এক পায়ের আজানু অনাবৃত, অন্য পা'টা কেমন দুমড়ে পড়ে কোমরের হাড়টা উঁচু হয়ে আছে। ছেলেটা হবার পর থেকে ওর চুল উঠে যাচ্ছিল ; যা সামান্য ক'গাছা আছে কতক বালিশে কতক ওর মুখে ছড়িয়ে আছে। কেশবিরল সীমন্তে সিঁদূরের দাগটা স্বল্পালোকেও জ্বল্ জ্বল্ ক'চ্চে ! মনটা যেন বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল। যা কিছু আজ চোখে প'ড়চে যেন মূর্ত্ত অসঙ্গতি। অবিবাহিতা, সুন্দরী, বন্ধু নীলাকে সেদিন যখন চিঠি লিখ্ছিলুম তখনও আশপাশে অসঙ্গতির অভাব ছিল না, টেবিলে কাগজ-পেন্সিল কেতাবের সু-উচ্চ পিরামিড্, তাতে ধূলোর রাজত্ব, ছেঁড়া কাগজের রাশ,—সব চাইতে বড় অসঙ্গতি অমন সুন্দর শ্রাবণ-ধারার ঐক্যতানে সেই মাদ্রাজী মেয়েটার বিশ্রী বেসুরো চিৎকার। কিন্তু এ সব তুচ্ছ করে মন সেদিন সুন্দরের আরাধনায় তন্ময় হয়েছিল,—সেই ভাই বোনের কোঁদল, বাদলসন্ধ্যা, কালো রং, সুদূরের চাহনি। যেন ছবি !

হঠাৎ মনে পড়ল, কাল নীলা ক্ষোভ কচ্ছিল আমায় যে' করে অবধি ও একখানা ভালো শাড়ী পরতে পায়নি—হাতের চুড়ী ক'গাছি ক্ষয়ে সরু হ'য়ে গেছে, ভেঙ্গে গড়বার সুযোগ

হয়নি। ও বলে ছেলেমেয়ে দুটা না হলে ও ফের মাষ্টারী করত—আরো এমনি কত কি বলে। কি বিশ্রীই ওকে তখন দেখায়। ওর ঐ চোখে নাকি আপ্‌নাহারা সুদূরের পিয়াসী চাউনি কখন ছিল ?—বিশ্বাসই হতে চায় না।

একশো টাকার মাষ্টারী ছেড়ে তিনশো টাকা মাইনের বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ভ্রাম্যমান এজেণ্ট হয়েচি। তখন একশো টাকার পঞ্চাশ টাকায় গাঁয়ের মিড্‌ল ইস্কুলটা চল্‌ছিল, এখন তিনশো টাকাতেও মাসে মাসে সংসারে পঞ্চাশ টাকার দেনা হয়। এম্‌নি সব লাভ লোকসানের হিসাব করতে করতে চোখে তন্দ্রায় জুড়ে এলো।......

হঠাৎ বিছানার পাশে আওয়াজ শুন্‌লুম,—"আজ উঠ্‌বে না নাকি গো—চা জুড়িয়ে গেলে কিন্তু ফের গরম ক'রে দিতে পারব না তা বলে দিচ্ছি!" চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম পূবের আকাশ থেকে গলানো সোণার ধারা ঘরে লুটিয়ে পড়েচে। গিন্নি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর রাঙা পেড়ে শাড়ীর উরন্ত আচলখানি সেই আলোকে একবার ঝল্‌কে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কুলটা।

তেমন সুন্দরী দেখা যায় না বিশেষতঃ গরীবের ঘরে তো নয়ই। লোকে ব'লত যেন 'গোবরে পদ্মফুল'! শ্রীপুরের নন্দ কৈবর্ত্তের মেয়ে মাধুরীর এম্‌নি রূপ। একুশ বছরের পূর্ণ যৌবনের ভরা জোয়ার তার দেহে কানায় কানায় উছলিয়া পড়িত। তাহার পানে একবার চোখ পড়িলে মুহূর্ত্তের তরেও অন্ততঃ আপ্‌নাহারা হইয়া অবাক্‌ না হইবার জো ছিল না। অথচ সে বালবিধবা, অথচ সে তার নিঃস্ব বাপের মেয়ে। চার মরা ছেলের পর বিপত্নীক বাপের সে এক মেয়ে। বাপে তাহাকে সাদা কাপড় পরিতে দিত না, মেয়ের চুলও ছাঁটিতে দেয় নাই, হাতের দু দু গাছি বেলোয়ারী চুড়ীও ভাঙ্গিতে দেয় নাই। মাধুরী বুড়া বাপকে রাঁধিয়া খাওয়াইত, কখন কখন এবাড়ী ওবাড়ী বৌ-ঝিদের কাজে যাচিয়া সাহায্য করিত, আর পানের রসে ঠোঁট রাঙাইয়া মিষ্টি-হাসি ছড়াইয়া পাড়া ঘুরিয়া বেড়াইত। গাঁয়ের বুড়া বুড়ীদের রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে কিল্‌বিলি করিত এই সোমত্ত মেয়েটার চাল চলন দেখিয়া, আর বকাটে ছেলের দল নানান্‌ ছল ছুতায় নন্দ কৈবর্ত্তের বাড়ী আনা গোনা করিত। নন্দ কৈবর্ত্তের তাহাতে সুবিধা বই অসুবিধা ছিল না কারণ তাহার সাত পাঁচ ছোটো খাটো কাজে অযাচিত সাহায্য করিয়া ঐ ছোঁড়ার দল নিঃস্বার্থ পরার্থপরতার চরম

পরাকাষ্ঠা দেখাইতে একান্ত উদ্‌গ্রীব ছিল, কিন্তু তাহাতে হরিনামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে নন্দ অস্বস্তি বই স্বস্তি বোধ করিত না, আর মাধুরী আপন মনে হাসিয়া কুটি কুটি হইত।

গাঁয়ে বৃন্দাবন চাটুয্যে সমাজের চাঁই, নৈকষ্য কুলীন। লগ্নী কারবার করিয়া তিনি বড় লোক। শ্রীমান্ বিপিন চাটুয্যে তাঁর একমাত্র দুলাল। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর আড়ি বলিয়াই বোধ হয় সে তেইশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় বার ছয় সাত ফেল হইয়া তিন বৎসর যাবৎ বাবরীকাটা চুলের কসরৎ আর সখের থিয়েটারের দলে ক্ল্যারিওনেট বাজ্‌নার মহড়া দিতেছিল। একবার ইতিমধ্যে কলিকাতায় গিয়া সে আদ্দির গিলাকরা পাঞ্জাবী পরিতে, পাম্পসু পায় দিতে, ফিন্‌ফিনে কাপড়ে ধূলায় লোটান কোঁচা ছাড়িয়া দু আঙ্গুলে ছড়ি ঘুরাইয়া চলিতে ও ঠোঁট বাঁকা করিয়া সিগেরেটের ধোঁয়া ছাড়িতে শিখিয়া আসিয়া গ্রামবাসী ছেলে বুড়ো সবাইকে তাজ্জব করিয়া দিয়াছিল। একদিন সেও ঘাটের পথে সিক্তবসনা মাধুরীকে ফিরিতে দেখিয়া নন্দ কৈবর্ত্তের মহাভক্ত হইয়া পড়িল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, আহা বুড়ো মানুষ একলাটী থাকে, আর এমন ভক্ত লোক,—দু দণ্ড গিয়া ওঁর কাছে বসিতে কার প্রাণ না চায়। দু' একদিন কীর্ত্তন গাহিয়া বুড়া নন্দ কৈবর্ত্তের চোখে জল বহাইয়া সে ছাড়িয়াছে।

দৈবের বিড়ম্বনা—একেই বলে কালস্য কুটিলা গতি। একদিন শোনা গেল মাধুরী তাহার বুড়া বাপকে ছাড়িয়া বিপিন চাটুয্যের সঙ্গে পলাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আবিষ্কার করিতে লোকের দেরী হইল না যে বিপিনের মায়ের গহনার বাক্সে নাকি সেই দিনই সোণার সাতনর, হার ও চুড়ি বালা অনন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

বুড়াবুড়ীর দল সাস্ফালনে কহিতে লাগিলেন,—হঁ্যা বলিয়াই তো ছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। বয়াটে ছোঁড়ার দল নন্দ কৈবর্ত্তের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া যে যাহার নতুন নেশার খোঁজে মন দিল। বুড়া নন্দ কৈবর্ত্তের সদাহাস্য মুখখানি আঁধারে ঢাকিল।

মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন সকালে বিপিন চাটুয্যে বাড়ী ফিরিল। বাপে মায়ে হারাণো ছেলে পাইয়া হাতে চাঁদ পাইলেন। বৃন্দাবন চাটুয্যে রটাইলেন নচ্ছারী মাধুরীই নানান্ ছলাকলা করিয়া তাঁহার ছেলেমানুষ ছেলেটীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, ভগবানের কৃপায় তাঁহার সোনার চাঁদ ছেলে সে সর্ব্বনাশীর বেড়া জাল কাটিয়া আসিয়াছে। সমাজের অন্যান্য চাঁইরা বলিলেন,—"হ্যাঃ, ব্যাটাছেলে, তার এতে আর এসে গিয়েছে কি ?" বুড়া বুড়ীর দল বলিলেন, তা বটেই তো, বজ্জাত মাগী যে ঢং করে ফুর্ ফুরিয়ে ফির্ত ইত্যাদি ইত্যাদি" বখা ছেলের দল বলিল "বিপ্নে বেশ মজাটা লুট্লেরে বাবা।"

মাসেক পরে নন্দ কৈবর্ত্ত মারা গেল। লোকে ভাবিয়াছিল বুড়ার যে বিঘা দুই ভুঁই আর বাড়ী ও তার চার পাশে যে ফলের বাগানটুকু আছে, তাহা সে নিশ্চয় গ্রামের জাগ্রতদেবী রক্ষাকালীর সেবার জন্য দিয়া যাইবে, কিন্তু দেখা গেল বৃদ্ধ তাঁহার সামান্য যা কিছু মরিবার সময় পলায়িতা কন্যাকেই দিয়া গিয়াছেন। বুড়ার মৃত্যুর সাত আটদিন পরে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ লোকে দেখিল বুড়ার নিরালা কুটীরের ভেজান দরোজা খোলা, আর তার ভিতরে বুকভাঙ্গা চাপা কান্নার সে কি আওয়াজ! আশে পাশের লোকেরা নিশ্চয় ঠাওরাইল এ ভুতের কাণ্ড, ভয়ে তাহাদের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। পরদিন দেখা গেল সে মাধুরী।

সমাজের চাঁইরা ক্ষেপিয়া উঠিলেন, কুলটাকে খেদাও—কুলটার গাঁয়ে স্থান নাই। বুড়া বুড়ীর দল বৌ-ঝিদের শাসাইয়া দিলেন খবর্দ্দার মাধুরীর সাম্‌নে যেন তারা ঠোঁট না মেলে। বখা ছেলের দল আবার এক নূতন মজা পাইল।

বিপিনের লম্বা চওড়া কথার প্ররোচনায় বাড়ী ছাড়িয়া কিছুদিন পরে মাধুরী যখন দেখিল যে বিপিন তাহার কথামত তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী নয় তখন তাহার প্রাণ ঘৃণায় লজ্জায় বিষাইয়া উঠিল। একদিন রাত্রে সে দ্বিতীয়বার গৃহত্যাগিনী হইল। এদিকে বিপিনও ভালো মানুষটী সাজিয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু মাধুরী ঘরে ফেরে কি করিয়া? কোন মুখে সে স্নেহময় বুড়া বাপের সাম্‌নে গিয়া আবার দাঁড়াইবে?

আর পরিচিতদের বিদ্রূপ তাচ্ছিল্য করা দৃষ্টি, সে কি সওয়া যায় ! কিন্তু মাসেক নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে স্থির করিল ; না— বাপের কাছে সে যাইবেই তারপর যা হয় হইবে। অপমান, অবজ্ঞা, বিদ্রূপই যদি সে সহিতে না পারিল, তবে এমন দুঃসাহসের পথ সে নিজেই বাছিয়া লইয়াছিল কেন ? কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিল কুলত্যাগিনী তাহারই জন্য ক্ষুদ কুঁড়া যাহা কিছু রাখিয়া তাহার স্নেহময় পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। বাপের বালিশে মুখ চাপিয়া সে সারারাত পড়িয়া কাঁদিল।

ইহার দুই তিন দিন পরে সত্যিই একদিন সকালে গ্রামের সমাজের কর্ত্তারা তাহাকে আসিয়া হুকুম করিলেন তাহার গাঁ ছাড়িতে হইবে। আর্কফলা দোলাইয়া এক একজন চাঁই লম্বা চওড়া এক এক বক্তৃতা দিলেন। সকলের উত্তরে মাধুরী ক্ষুদ্র একটী জবাব দিল “বাপের ভিটা ছেড়ে আমি যাবো না” সবার চাইতে গলা সপ্তমে তুলিয়া বৃন্দাবন চাটুয্যে চেঁচাইলেন “কী এতবড় কথা, মাগীকে ঝাঁটা পেটা করে দূর করবো—।” মাধুরী নিরুত্তর। তারপরে সপ্তমের গলা নবমে চড়াইয়া সকলে মহাবীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সবলে এই অসহায়া বালিকাকে গ্রাম হইতে দূর করিবার উদ্যোগ করিতেছেন,—এমন সময় কোথা হইতে দীনু বাগ্দীর ছেলে হরে বাগ্দী তার ছয় ফুট লম্বা বলিষ্ট দেহখানি ও হস্তে সাতফুট লম্বা পাকা বাঁশের লাঠিগাছ লইয়া উঠানে উঠিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল “ও এখানেই থাক্‌বে, আপনারা

যান।” বৃন্দাবন চেঁচাইয়া বলিলেন হ্যাঁরে হরে তুই—” ঘাড় নোয়াইয়া হরে বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ আমি। মিছেমিছি আর চ্যাঁচামেচি করবেন না – মাধুরী গাঁয়েই থাক্‌বে।” তার কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া সকলে রণে ভঙ্গ দিলেন। বৃন্দাবন দাঁতে দাঁত খিঁচিয়া বলিয়া গেলেন “আচ্ছা, দেখা যাবে!” মাধুরী কৃতজ্ঞ নেত্রে সেই উন্নত বলিষ্ঠ দেহখানির পানে চাহিল। হরে চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল “তোমার কিছু ভয় নেই মাধুরী,—ওরা আর আস্‌বে না।”

হরে বাগ্দীর বাপ দীনু বাগ্দী তেজারতি করিয়া বিলক্ষণ দু পয়সা জমাইয়া বৃদ্ধ বয়সে যখন ধর্ম্মে মন দিল, এবং হঠাৎ ডোর কৌপীন সম্বল করিয়া বৈষ্ণব হইল, তখন লোকে ভাবিয়াছিল যে বুড়া বয়সে কণ্ঠি বদল করিবার সখেই বোধ হয় তাহার এই অভিনয়, কিন্তু তারপর দুই বছরের মধ্যেও তেমন কিছু না করিয়া সে যখন মরিল তখন লোকে আরও আশ্চর্য্য হইল। তখন তাহার কৃষ্ণভক্তিতে বিশ্বাস না করিয়া উপায় ছিল না। এ হেন বাপের ছেলে বলিয়াও কতকটা, আর হ’রের ঘরের খাইয়া পরের মহিষ তাড়াইবার অভ্যাসেও কতকটা এই প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠদেহ ছেলেটীকে গ্রামের সবাই প্রায় স্নেহের চক্ষে দেখিত। মরা পোড়াইতে, রোগীর সুশ্রূষায়, গ্রামে আগুন লাগিলে আগুন নিভাইতে হরে বাগ্দী ওরফে হরে বোষ্টম হাজির আছেই। এই হরে বোষ্টম ছেলেবেলা হইতে মাধুরীকে

দেখিয়া আসিতেছে ও কেমন করিয়া কখন যে তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা সে নিজেই জানে না। সে বহুদিনের কথা, কতদিন মাধুরীকে দক্ষিণা বাতাসের মত নগ্ন পদে গ্রাম্যপথে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া তাহার প্রাণখানি যাইয়া তাহার চঞ্চল চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া আকুলিবিকুলি করিয়াছে, কতদিন সে তাহার রাঙা ঠোঁটে একটু হাসির রেখা দেখিয়া আপন মনে নাচিয়া সারা হইয়াছে, কতদিন স্নানসিক্ত-বসনা মাধুরীকে দেখিয়া সে বিস্মিত পুলকে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া সেই রূপের ধ্যান করিয়াছে,—তাহার ইতিহাস শুধু তাহারই স্মৃতির পাতে পাতে লেখা আছে। তার পর সে কুল ত্যাগ করিল,—আবার ফিরিয়া আসিল। জগতের চক্ষে নাকি সে ঘৃণ্য, কিন্তু কৈ তাহার কাছে তো তেমনটীই আছে, এখনও তার প্রত্যেকটী ভঙ্গিমা অসহ্য পুলকে তাহার দেহ মন ছাইয়া ফেলে, এখনও তো তাহার চোখে চোখে পড়িলে সসম্ভ্রমে তার চোখের পাতা নামিয়া আসে!

মাধুরীর দুর্দ্দিন পড়িল। ভূঁইয়ে তো চাষ দিবার লোক নাই, বর্গাও কেউ লয় না—তাহার সহিত লেনদেন করিয়া এক ঘরে হইতে যাইবে কে? সে স্থির করিল বাড়ীর নানান্ গাছের ফল বিক্রী করিয়া আর চরখা কাটিয়া সে দিন গুজরাণ করিবে। সকল পরামর্শে এখন হরে তার দক্ষিণ হস্ত, কারণ হরে বোষ্টম কারুর পরোয়া করে না, কিন্তু তাহা ছাড়া কোন কিছু বিশেষ

ভাবে মাধুরীকে সাহায্য করিবার একটা সুমধুর কল্পনা হরের মনে জাগিলেও সে তাহার আপনাতে আপনি অটল-মূর্ত্তি দেখিয়া সাহস পায় না ;—আরও বেশী করিয়া মুগ্ধ হয়।

মাধুরী ফল বেচিতে হাটে যায়। রামা, শ্যামা, যদু, মধু বয়াটে ছোঁড়ার দল এবারো তার দোকানে ভিড় করিয়া থাকে, কিন্তু মাধুরীর দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্যে তাহাদের দৃষ্টি ঠিকরিয়া আসে, তথাপি তাহাদের অনুচ্চ কণ্ঠ নিঃসৃত দু' একটা অশ্লীল কথা তাহার কাণে আসিয়া পৌছায় কিন্তু সে দাঁতে ঠোঁট কাটিয়া বসিয়া থাকে। এযে তার ন্যায্য প্রাপ্য! হরে বোষ্টম হাটের মধ্যে আনাগোনা করিতে ঐ ছোড়াগুলার পানে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যায় ; যেন সে পারিলে উহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলে,—কি বিশ্রী ভাবেই উহারা মাধুরীর পানে তাকাইয়া থাকে! মাঝে মাঝে বিপিন চাটুয্যে হাটে আসিলে মাধুরীর দুইশো হাত দূর দিয়া না দেখা ভাবে যেন পালাইয়া বাঁচে, আর মাধুরী নির্ব্বিকার নেত্রে একবার চাহিয়া চোখ ফিরায়।

হরে বোষ্টম আর পারে না। একদিন মাধুরীকে বলিয়া ফেলিল সে তাহাকে ভালবাসে—সে কি তাহার হইবে ?

শুনিয়া মাধুরীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে সে হরের দুহাত হাতের মুঠায় তুলিয়া লইয়া বলিল আমায় মাপ করো ভাই, আমি তোমার মত দেবতার যোগ্য নই—আমি বড় পাপিষ্ঠা, আমি যে তাকে এখনও ভুলতে পারি নে, আমি—

আমি—" "থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না" বলে হরে বোষ্টম তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া মাধুরীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "ছি কেঁদো না, কাঁদতে আছে কি, ছিঃ—কেঁদো না" আর কোন কথা বুঝি তাহার ঠোঁটে জোগাল না।

হঠাৎ মাধুরীর একদিন কলেরা হইল। রামা শ্যামা যদু মধুর দল নানান ছুতায় তাহার কাছে ভিড় জমাইত বটে, কিন্তু রোগীর শয্যাপার্শ্বে কেহ আসিলনা। দুই দিনের দিন রাত দুপুরে হরে বোষ্টমের কোলে মাথা রাখিয়া মাধুরী মরিল।

কেহ তাহাকে পোড়াইতে আসিল না,—রামা শ্যামা যদু মধুর দলও না, কেন না সে যে কুলটা! হরে বোষ্টম সারা রাত মড়া আগলাইয়া বসিয়া সকালে সতীশববাহী মহাদেবের মত একা শব কাঁধে লইয়া অশ্রুজলে তাহাকে ধুইয়া শ্মশানে দাহ করিয়া আসিল।

সমাজকর্ত্তারা বলিলেন যে সূর্য্য চন্দ্র এখনও ওঠে ও অস্ত যায়, অতএব মাধুরীর বাসিমারা হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী ছিল বলিয়াই হইয়াছে, এবং দুশ্চরিত্রা কুলটার ফল হাতে হাতে, কৈবর্ত্তের মেয়ে হইয়া সংকার হইল বাগ্দীর হাতে! বুড়াবুড়ীর দলও বলিলেন—তাই তো, তাই তো! রামা শ্যামা যদু মধুর দল হরে বোষ্টমের পরার্থপরতার কারণের সমালোচনায় মাথা ঘামাইতে লাগিল। * * *

ইহার দুই সপ্তাহ পরে এক ভয়ানক উচ্চ বংশের কুলীন কন্যার সহিত বৃন্দাবন চাটুয্যের একমাত্র পুত্র বিপিন চাটুয্যের বিবাহ হইয়া গেল। গ্রামের সমাজকর্ত্তাগণ বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় বলাবলি করিতে করিতে গেলেন "একেবারে রাজ যোটক হয়েছে, হবে না—যেমন বাবা তেমন ছেলে, তেমনি শ্বশুর"। পাত্রের শ্বশুর মহাশয় দারোগা, চল্লিশ টাকা মাইনার চাকুরী করিয়া বাড়ীতে তিনতালা দালান তুলিয়াছেন।

অভিমান।

বুধবার। খাওয়াদাওয়ার পর শাশুড়ীকে দুই অধ্যায় গীতা পড়িয়া শুনাইয়া, ছোট ঠাকুরঝির সঙ্গে কিছুক্ষণ ইয়ার্কি দেওয়ার পর শোবার ঘরে ঢুকিয়া অপর্ণা দেখিল তাকের উপর অ্যানসোনিয়া টাইমপিসটাতে একটা বাজিয়াছে। আজ স্বামী যতীশের সকালে ছুটি, সে কলেজ হইতে ফিরিল বলিয়া। অপর্ণা টেবিলের উপর হইতে আর্সিখানা লইয়া একবার নিজের মুখখানা দেখিল, পানের রসে ঠোঁটখানি টুকটুকে রাঙা হইয়াছে, একটু মুচকি হাসিয়া আর্সিটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। টেবিলের উপর ফোটো ফ্রেমে যতীশের একখানি ফোটো ছিল, সেখানা তুলিয়া লইয়া আচলদিয়া উপরের কাচটা পরিষ্কার

করিয়া মুছিয়া একবার চকিতে, সেই নির্জ্জন ঘরেরও চারি দিকে চাহিল, এবং চুক্ করিয়া ছবির মুখে ছোট একটী চুমা দিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তারপর শেল্‌ফ হইতে প্রবাসীখানা টানিয়া লইয়া ইজি চেহারটায় দেহ এলাইয়া দিল, খোলাচুলের রাশ কতক বুকে, কতক কাধে, কতক মাটী ছুঁইয়া লুটাইয়া পড়িল। অপর্ণা চমৎকার সুন্দরী।

খুট করিয়া দরোজায় কি শব্দ হইল না?—ঐ বুঝি! দূর ছাই ও যে কালো বিড়ালটা লাফদিয়া পালাইল। ঐ না কার গলার আওয়াজ,—না, ও তার দেওর জ্যোতিরিন্দ্র ঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে। ঐ না জুতার শব্দ পূবের ঘরে গেল? বড়ঠাকুর কাছারী হইতে আসিলেন। কিন্তু কৈ, যতীশের আজ হইল কি? প্রবাসীর সরস গল্পে মন বসিল না। সে ছুঁড়িয়া সেটা টেবিলের উপর ফেলিয়া, চর্খা ও তুলার পাঁজ লইয়া বসিল। কিন্তু না, যতীশের দেখা নাই দেড়টা, দুইটা, আড়াইটা তো বাজিল। অপর্ণার ভারী রাগ হইতে ছিল। আজ তাহাকে বোটানিক্যাল গার্ডেনস্ এ লইয়া যাইবার কথা, গত দুই রবিবার হইতে কেবল যতীশ কথা ফিরাইতেছে। আজ ও বোধ হয় ফাঁকি দিবারই মতলব। তারপর সে আবার ভাবিল হয়তো কোনো বিশেষ কাজে তাহার দেরী হইতেছে, অপর্ণা সাজগোজ করিয়া তৈরী হইয়া থাকুক যতীশ আসিলেই যেন ট্যাক্সি ডাকিয়া রওনা হওয়া যায়। পরণের বঙ্গলক্ষ্মীর লালপেড়ে শাড়ীখানা

ছাড়িয়া অপর্ণা একখানা খদ্দরের শাড়ী পরিল, সেমিজ তো পরাই ছিল, তাহার উপর একটা ব্লাউস গায়ে দিল, তার পর চক্‌চকে সবুজ জরির কাজ করা নাগরী জুতাজোড়া ফুট্‌ফুটে সাদা পায়ে পরিল, চুলটা চিরুণিতে একটু ফিরাইয়া সিদূরের টিপ দিল। কিন্তু কৈ তিনটাও যে বাজিয়া গেল, যতীশের তো পাত্তাই নাই। ক্ষোভে অভিমানে তাহার যেন কান্না পাইতেছিল। জুতা ছাড়িয়া সে ফের সূতা কাটিতে কাটিতে ভাবিতে লাগিল যতীশ তাহার একটা কথাও রাখে না, মানুষের মধ্যেই তাহাকে গণ্য করে না, এই বুঝি তাহার ভালোবাসা—সে না কাল আজকার এই শিবপুর যাইবার সখে ভবানীপুর মাসীমার বাসায় পর্য্যন্ত গেলনা—মেশোমশাই লইতে আসিয়াছিলেন ; আর যতীশ কিনা দিব্যি হয়তো কোথায় গিয়া কোন্ আড্ডায় চুরুট ফুঁকিতেছে আর তাস খেলিতেছে। এই চুরুট ফোঁকা—আর তাস খেলা দুইটা অপর্ণা দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না ; সময়ে অসময়ে আড্ডাধারীরা তো ইহারই মোহে মুগ্ধ করিয়া যতীশকে বাসা হইতে টানিয়া লইয়া যাইত। সাড়ে চারটাও বাজিয়া গেল আজ আর যাওয়া তো হইতেই পারে না সে বিরক্ত হইয়া ব্লাউসের বোতামগুলা খুলিয়া সেটা গা হইতে খুলিয়া ফেলিবে এমন সময় যতীশ মচ্ মচ্ করিয়া ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই সজ্জিতা পত্নিকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল “বাব্বাঃ একেবারে সাজ গোজ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে—” অপর্ণার মুখচোখ

লাল হইয়া উঠিল সে যে সাজগোজ করিয়া যতীশের জন্য ছাপ্রত্যাশে বসিয়াছিল, ইহাই শেষে যতীশ ভাবিল, তাহা লইয়া আবার বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না। সে কিছু জবাব দিল না। ব্লাউসটা আলনায় ছুড়িয়া দিয়া, অভি গম্ভীর মুখে সে ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছিল, যতীশ ঠোঁটে হাসি চাপিয়া ঝাঁ করিয়া ফিরিয়া তাহার শাড়ীর আঁচল ধরিয়া ফেলিল, পরে জোর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল "এত রাগ করলে বাঁচি কি করে বলত তো ?"

"রাগ আবার কি ?"

"মোটেই রাগ নেই, কথাটি না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া অসীম প্রীতির লক্ষণ কি বল ?"

অপর্ণা সংক্ষেপে উত্তর দিল "তোমার খাবার আনতে যাচ্ছিলাম" "রোজ আমি এলেই একটা কথাও না বলে খাবার আনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়, কেমন ?"

প্রায় প্রত্যহই অপর্ণা স্বামী কলেজ হইতে ফিরিলে চোগা চাপকান জুতা মোজা খুলিয়া লইত, কিছুক্ষণ পাখা দিয়া বাতাস করিত ও খাবার আনিতে যাইবার পূর্ব্বে যতীশের মুখে এমন কিছু খাইতে দিয়া যাইত যাহাতে সে বলিত তাহার নাকি লুচি সন্দেশের চাইতে ও বেশী পেট ভরে।

অপর্ণা হটিবার মেয়ে নয় সে জবাব দিল "আজ দেড়টায় ফিরবে বলে দুটিখানি মাত্র খেয়ে গেছ লে,—তা

ফিরলে যখন সাড়ে চারটায়, তখন ব্যস্ত একটু হতে হয় বৈ কি !"

অপর্ণার গালে একটা টোকা দিয়া যতীশ বলিল "বাপরে একেবারে ফোঁস কেউটে হয়ে আছ যে, কিন্তু সত্যি বলছি বাপু, ছুটির পরে এম্‌নি ঠেকে গেলাম যে"—

"সে কথা তো আমি জানতে চাইনি ছাড় তোমার খাবার নিয়ে আসি"

"খাবার আমি আজ খাবো না, রথীদের ওখান থেকে খেয়ে এসেছি"

রথীন্দ্রের নাম শুনিয়া অপর্ণা আরো চটিয়া গেল। রথীন্দ্র যতীশের সঙ্গে এক কলেজেরই অধ্যাপক, তার সমবয়সী। সেই হইল তাস খেলার চাঁই, আর দিনরাতই তার মুখে বর্ম্মা চুরুট জ্বলিতই।

"ছাড় তাহলে এবার যাই, কাজ আছে—"

"রাগ কোরো না লক্ষীটি ব্যাপারটা শোনই—"

"তোমার আগাড়ম বাগাড়ম আমি শুনতে চাই না, সে তোমাদের আড্ডায় কোরো" অনেকখানি ঝাঁঝের সঙ্গে কথা কয়টা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার রাগ চড়িয়াছিল আরো,—যতীশ খাইয়া আসিয়াছে শুনিয়া। সে আজ ভৃত্যকে খাবার তৈরী করিতে দেয় নাই—সে তিনটার সময় খাবার তৈরী করে বলিয়া, যতীশ তাহাকে কোথায় কোথায়

লইয়া যাইবে ইহা ভাবিতে ভাবিতে, অনির্ব্বচনীয় সোহাগ ঢালিয়া সে নিজে খাইয়া উঠিয়াই আজ তাহার জন্য খাবার রাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

"আচ্ছা আচ্ছা, না শুনিলে"—হাসিতে হাসিতে যতীশ বলিল **"Unconditional apology** চাইছি, মাপ করো—"

"মাপ করবার কি হোলো,—কথা দিয়ে কথা রাখোনি,—সে তো আজ আমার কাছে নূতন নয়—আমি একটা নেহাত তুচ্ছ লোক তোমাদের মতো মহাশয় ব্যক্তির কাছে,—কোথাকার কে—"

"বাঁ হাত দিয়া পত্নীকে জোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়া তাহার নোলকটা নাড়িতে নাড়িতে যতীশ মুচকি হাসিল, পরে অপর্ণার কানের কাছে মুখ আনিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল "কোথাকার কে, তুমি আমার, এবং তুমি অপর্ণাদেবী" এবারে অপর্ণা রাগ আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। যতীশের নিরুপদ্রবে মুখ টিপিয়া হাসা তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছিল। সে চাপা গলায় সতর্জ্জনে ভ্রূ কুচকাইয়া বলিল "ছাড়ো বলছি" এবং জোর করিয়া মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় যতীশচন্দ্রের মা দরোজা হইতে ডাকিলেন "বাবা যতীশ, ঘরে আছিস"—তাড়াতাড়ি পত্নীকে বাহু পাশমুক্ত করিয়া সে হাঁক দিল "আছি মা"—মা ঘরে ঢুকিলে অপর্ণা বাহির হইয়া গেল। মাতা পুত্রে কিছুক্ষণ সংসারের নানান

কথাবার্ত্তার পর মা চলিয়া আসিলেন। যতীশচন্দ্র অপর্ণা আসিবে প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ ঘরে অপেক্ষা করিল, কিন্তু সে আসিল না,—শেষে ভাগিনেয় সুকুমারকে ডাকিয়া বলিল "তোর মামীমাকে বল গিয়ে তো মামা পান চাইছে," মিনিট দশেক পরে অপর্ণা পান দিয়ে গেল। এবার তাহার অসম্ভব মেঘের মতো থম্‌থমে মুখ দেখিয়া যতীশ আর জোর করিয়া আটকাইল না, তাড়াতাড়ি বলিল "তুমি খাম্‌কা রেগেছ অপু, আমি নেহাত না ঠেকলে—ছুটির পরে প্রিন্সিপ্যাল—" অপর্ণা কথা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত থাকিল না, শুধু যাইবার সময় শান্তস্বরে বলিয়া গেল "বেশ"। সে এবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল চটিয়া কথা আর কহিবে না। এবং স্বামীটিকে যথেষ্ট শাস্তি না দিয়া এবার সে ছাড়িবে না। পিছন হইতে যতীশ ডাকিল "যেয়ো না শুনে যাও,—আমার মাথাটা বড় ধরেছে,—একটু—" ততক্ষণে অপর্ণা দৃষ্টির বাইরে চলিয়া গিয়াছে।

যতীশ সেদিন আর বেড়াইতে বাহির হইল না, মাথা ধরায় পড়িয়া রহিল—অপর্ণা চুপি চুপি তার ছোট ননদ ললিতাকে গিয়া বলিল ঠাকুরঝি একটু কাজে আমার হাতটা জোড়া, ওকে একটু ওডিকোলন দিয়ে এস তো মাথা নাকি ধরেছে। তারপর চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল "ভালো লাগলে একটু কপালে হাত বুলায়েও দিও কিন্তু—"

খাইয়া দাইয়া রাত্রি সাড়ে দশটার সময় অপর্ণা শুইতে আসিল। ইহার মধ্যে সে আর ঘরে আসে নাই। তখন তাহার রাগ অনেকটা পড়িয়া আসিলেও একেবারে নেভে নাই। আসিয়া দেখিল স্বামী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বটে এই তাহার মাথাধরা, আর অপর্ণার জন্য মাথাব্যথা! সে বিছানার এক কোণায় পড়িয়া রহিল। ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল, স্বামী দুই কনুইর উপর ভর করিয়া তাহার মুখের উপর ঝুকিয়া অতি সন্তর্পনে তাহার চুলে বিলি দিতেছেন। সে ত্রস্তে কাপড়চোপর ঠিক করিয়া লইয়া নিতান্ত নির্বিকার ভাবে যতীশকে প্রশ্ন করিল "মাথাধরা ছেড়েচে?"—"ছেড়েচে,···কিন্তু এত রাগ তোমার,—কাল সন্ধ্যাকালে একটিবার এলে না?" কাষ্ঠ হাসি ঠোঁটের কোণে টানিয়া অপর্ণা জবাব দিল "আমি রাগ টাগ করিনি, হাতে কাজ পড়ল তাই আসতে পারিনি"

"আচ্ছা বোটানিকেল গার্ডেন দেখতে তোমার এত ইচ্ছা হয়েছে তো আজ জ্যোতিঃকে নিয়ে যেও,—আমার আজ শেষ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্লাস আছে কিনা"—

"আজ বিকেলে মেশো মশাই আসবার কথা আছে, আমি তাঁর বাসায় যাচ্ছি কাল বিকেলে ফিরব। আর বোটানিকেল গার্ডেনে যেয়ে দরকার নেই, জ্যোতিঃ ঠাকুরপো বল্লে সেখানে গাছপালা ছাড়া নাকি আর কিছুই নেই।" এই কথা বলিয়া ঘরের জানালাগুলি সব খুলিয়া দিয়া অপর্ণা বাহির হইয়া গেল।

সারা সকাল অপর্ণার সঙ্গে যতীশের আর দেখা হইলনা। বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া সে শুনিল অপর্ণা তাহার মাসীর বাড়ী ভবানীপুর গিয়াছে। শুক্রবার বৈকালে অপর্ণা ফিরিয়া আসিল,—দিব্য হাসিখুসি চেহারা, যতীশ ভাবিল বুঝি গোল চুকিয়াছে। কিন্তু তাহার টের পাইতে বিলম্ব হইল না আর সবাইর কাছে অপর্ণা হাসিমুখে কথা কয় বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা কইতে সে যে হাসি হাসে তাহা নেহাত কষ্টকল্পিত ও যেন বেপরোয়া। সে দিন রাত্রে অনেক সাধ্য সাধনা, পরদিন কলেজ কামাই করিয়া বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব এমন কি শেষে অশ্রুজলে ও হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়াও যখন যতীশচন্দ্র পত্নীর মন পাইল না তখন মুখ তাহারো গম্ভীর হইয়া উঠিল। শনিবার উভয়ের মধ্যে একটি কথা হইল না—কিন্তু অপর্ণা ললিতার সঙ্গে এত হুটোপুটি আরম্ভ করিয়া দিল যে তাহার শাশুড়ী ডাক দিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন। সে দিন শরীর ভালো নাই অজুহাতে যতীশ কলেজ যায় নাই। কালো মুখ করিয়া ঘরে শুইয়া ছিল। রাত্রে একবার মাত্র যতীশ পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কষ্ট দেখলেই তুমি সুখ পাও কেমন?" গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়া অপর্ণা বলিল "পাই-ই তো"

সেদিন অপর্ণা রাত একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া চর্খা কাটিল। যখন শুইতে গেল পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছিল স্বামী নিদ্রা যান

নাই, কারণ যতীশ ঘন ঘন এপাশ ওপাশ করিতেছিল। এ তিন দিনে অপর্ণার আত্মাভিমান অনেকটা তৃপ্ত হইয়াছিল। নিদ্রাহীন স্বামীকে এপাশ ওপাশ করিতে দেখিয়া সে তাহার বুকের মাঝে বেদনা মিশ্রিত আনন্দটুকু মাপিতে মাপিতে কোন সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না।

ভোরে উঠিয়া অপর্ণা দেখে যতীশ কোঁকাইতেছে।

"ভোর রাত থেকে Colic টা আবার টের প্যাচ্ছি"—অপর্ণার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে তো জানে এই কলিকের বেদনা উঠিলে স্বামী কি দারুণ যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া সময় কাটান। ব্যগ্রকণ্ঠে অপর্ণা প্রশ্ন করিল "হঠাৎ এতদিন পরে বেদনা উঠ্‌ল যে"— ?

"কি করে বলব ?" "কোথাও কিছু খারাপ ঘিয়ের জিনিষ টিনিষ কিছু খাও নি তো ?" "মনে তো পড়ে না" ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় বেদনাটা দেখি, খুব বেশী কি ?"

"বাবা-রে—" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া যতীশ মুখ ফিরাইল এবং পাশ বালিশটা কোলে টানিয়া লইয়া বলিল—"না খুব বেশী নয়," পরে একটু যেন দম লইয়া আবার বলিল "তুমি তো ক'দিন থেকে নাকি নানান্ কাজে আট্‌কা আছ,—দয়া করে একবার ললিতাকে আমার কাছে একটু এসে বস্‌তে বোলো তো" স্বামীর রোগযন্ত্রনা দেখিয়া অপর্ণা অভিমান ভুলিতেছিল,—

যতীশের শেষ কথায় আবার তাহা জ্বলিয়া উঠিল—বেশ তাহাকে স্বামীর প্রয়োজনই নাই—নাই বা থাকিল। আসুক ললিতা— যতীশ দেখুক অপর্ণার মত আর কেউ তাহার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার মুখের প্রত্যেকটি ভাববিবর্ত্তন লক্ষ্য করে কিনা! এত রাগের মাথাতেও তাহার যেন বুক ঠেলিয়া কান্না উঠিতেছিল, সে কোনো মতে বলিতে পারিল "আমার বিশেষ কোন আবশ্যক নেই তাহ'লে"—

ছোট্ট একটী "না" বলিয়া যতীশ চুপ করিল, মুখ ফিরাইল না। আরো মিনিট দুই কাল যতীশের বিছানার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপর্ণা বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় যতীশ বলিল সে এবেলা কিছু খাইবে না কিছু যেন তার জন্য রাঁধা না হয়। অপর্ণার বার বার মনে হইতেছিল,—আজ তাহার রাগ করিয়া থাকা শোভা পায় না,—সব কাজ ছাড়িয়া যে তাহার প্রাণটা যতীশের বিছানার পাশে গিয়া আকুলি বিকুলি করিতেছে,—কিন্তু কি দুরন্ত অভিমান যে তাহাকে পাইয়াছে! সে যাইবে কেন, কি করিয়া সে যাইবে? —যতীশ তো স্পষ্টই বলিল তাহাকে কোনো দরকার নাই। সে রান্না ঘরে থাকিয়া মনশ্চক্ষের সামনে স্বামীর বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি কল্পনা করিতে লাগিল আর বাণবিদ্ধা হরিণীর মতো ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কলিকের বেদনা উঠিলেই যতীশের একটী উপসর্গ জোটে— তখন পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলাইলে স্বস্তি অনুভব করে,

ললিতা এসব পারিবে—পারিবে বৈ কি? তাহাকে তো কোনো দরকার নাই। তবু সে থাকিতে পারিল না। ললিতা কোনো কারণে ঘরের বাহিরে আসিলেই ছুটিয়াই গিয়া খবর লইতেছিল "কেমন আছেন এখন ঠাকুরঝি" "বড় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছেন—আজ ওসব ছাই পাঁশ রেখে তুমিই গিয়ে একটু বোসো না বৌদি দাদার কাছে—" "না—ঠাকুরঝি আধখানা কাজ ফেলে—"

"কি এমন মহাকাজ, দেখি আমি কর্ছি, তুমি যাও, একটু আগেও তোমার কথা বল্‌ছিলেন দাদা"—"আমায় ডেকেছেন কি?" "না ডাকেন নি, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন তুমি কি করছ, আমি বল্লাম, 'রান্নাঘরে', একথা শুনে ফের বল্লেন 'থাক ডেকোনা কাজ নেই', হয়তো ভাবলেন তুমি খুব কাজে ব্যস্ত আছ"—"সত্যি ব্যস্ত আছি, এখন আমি কিছুতে যেতে পারবো না, ফুরস্থৎ পেলেই যাবো এখন।—হ্যাঁ আর ছাখো বেদনা খুব বাড়্‌লে এক ডোজ কার্ড্‌য়াস ম্যারিয়ানাস্‌ দিও তো—দেবে বুঝ্‌লে? "আচ্ছা"!

সকলের খাওয়া দাওয়া হইলে অপর্ণা ললিতাকে ডাকিতে যাইবে এমন সময় ললিতা আপনিই ঘরের বাহির হইয়া আসিল। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল "এখন কেমন আছেন?" "ঘুমুচ্ছেন"—অপর্ণা অনেকটা আশ্বস্ত হইল, প্রশ্ন করিল "ওস্থধ দিলে?" "না কিছুতেই খেলেন না বল্লেন আজ ওস্থধ খাবেন না, খেতে হয় তো কাল থেকে খাবেন।"

কোনো মতে দুইটা ভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া অপর্ণা ঘরে আসিয়া দেখিল যতীশ তখনও ঘুমাইতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস নিয়মিতই পড়িতেছিল। বুক তাহার বেদনায় ভরিয়া উঠিল, কত কষ্টই না যেন উনি আজ পাইয়াছেন,—সে যদি উহার একটু ভাগ লইতে পারিত! বেদনার ক্লিষ্টতায় ও অনাহারে ঠোঁট দুখানি শুখাইয়া উঠিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল দুই বাহু দিয়া প্রিয়ের দেহখানি জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণভরা ভালোবাসা দিয়া যতীশের সমস্তখানি কস্টই মুছিয়া লয়। ওগো ঠাকুর, ঘুম হইতে উঠিয়া যেন আর তাঁহার বেদনা না থাকে। আজ চারদিন হইল স্বামীর সঙ্গে তাহার একটি ভালো করিয়া কথা হয় নাই। সে ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে যাইয়া স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ভয় হইতেছিল যদি জাগিয়া উঠেন,—দেখেন যে উপযাচিকা হইয়া সে তাঁহার সেবায় আসিয়াছে! একটু পরে বুঝিল এ ঘুম সহজে ভাঙ্গিবে না, সে ভাবিল কিছুক্ষণ পরে ললিতাকে ডাকিয়া দিলেই চলিবে। তখন সে পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিয়া সন্তর্পনে দরোজায় খিল দিল। পরে আবার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতেই তাহার মুখ খানিতে লালের ছোপ ঘনাইয়া উঠিতেছিল,—তখন সে ধীরে ধীরে স্বামীর বুকের দুইপাশে দুই বাহুতে ভর করিয়া আস্তে তাহার ওষ্ঠে ওষ্ঠে স্পর্শ করিল। কিন্তু যেই উঠিতে যাইবে, অমনি দেখিল যে দুই খানা

দৃঢ় বাহুর দুশ্ছেদ্য বাঁধনে তাহাকে সেই সুযোগে বাঁধিয়া ফেলিয়া যতীশ ধাঁ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল ও চুমায় চুমায় তাহার দম আট্‌কাইয়া দিবার যোগাড় করিল। তখন অপর্ণার অভিমান কোথায় গিয়াছে সে জানে না, দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া অনির্ব্বচনীয় সোহাগ ভরা গলায় সে বলিল "ব্যাথাটা একেবারে গেছে তো ?" হো হো করিয়া হাসিয়া যতীশ বলিল "তবে না তুমি আমায় কষ্ট দিয়েই সুখ পাও ?"

"সে কথা যাক্—বেদনাটা কেমন এখন"—"ওগো আমার বোকা বৌ, বেদনা দূরস্থান, মাসেকের মধ্যে আমার পেটটাও ফাঁপেনি, এসমস্ত তোমায় বন্দী করার ফন্দি বুঝ্‌লে ? অপর্ণা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল "তুমি কি ভীষণ লোক, মটকা মেরে পড়েছিলে ?"

রীতিমত বাদশাহী কায়দায় সেলাম করিয়া যতীশ কহিল "বিবি সাহেবা, এবার বান্দার কসুর মাপ হয় ?"

"যাও—দুষ্টু"

"যাচ্ছি"—বলিয়া যতীশ উঠিয়া তাহার প্যাশের দরোজা খুলিয়া তাহার বসিবার ঘরের টেবিলের দেরাজ হইতে রংচঙা একটা বড় বাক্স লইয়া আসিল। সেটার ঢাকনা খুলিতেই সাদা ধব্‌ধবে আইভরির তৈরী অতি চিকণ কাজকরা একটী তাজমহলের নমুনা বাহির হইয়া পড়িল। যতীশ বলিল "তুমি সেদিন Municipal marketএ চার আঙ্গুল একটা ivoryর

তাজ দেখে ক্ষেপে গিয়েছিলে, কিন্তু ত্মখোতো এটা কেমন ?"

"চমৎকার—এটা পেলে কোথায় ?"

"এবার ক্ষেপী আমার কৈফিয়ৎটা শোন। সে দিন একটায় আমার কাজ শেষ হলে **Principal** তাঁর একটা ক্লাস এক ঘণ্টার জন্য আমায় নিতে বল্লেন। সেই ঘণ্টার পরে রথীর ছুটি হোলো রথী কথায় কথায় বল্লে তার কে এক মাসতুতো ভাই পশ্চিম থেকে কি নানান সব **ivory** জিনিষ বিক্রী করতে এখানে এনেছে তার মধ্যে একটা তাজ আছে যা একেবারে **splendid** আমার তোমার কথা মনে পড়ল বল্লাম আমার জন্য সেটা রেখে দিও তো। রথী বল্লে জিনিষগুলা হু হু করে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে তক্ষুনি গিয়ে ওটিকে হস্তসাৎ না করলে হয়তো আর কেউ নিয়ে নেবে। কাজেই সেখানে গিয়ে বাড়ী আস্তে আস্তে দেরী হয়ে গেল। তুমি তো রেগে চাঁই হলে আমার কথাটা পর্য্যন্ত শুনতে চাইলে না কিন্তু কার জিত হোলো এখন শুনি ?"

তাজটিকে দুই হাতে তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে অপর্ণা মিটি মিটি হাসিয়া জবাব দিল "কেন—আমার। এখন চমৎকার জিনিষটি আমিই পেলেম তো।"

"বাঃ জিৎহারের মধ্যে একথা এলো কিসে ?—যাক জিৎ চিরদিনই তুমি জুলুম করে বল্‌বে তোমার! ভালো যা' হোক্ এটা পছন্দ হয়েছে, তো ?"

"খু—ব ভালো পছন্দ হয়েছে,—বাঃ সত্যিই splendid ! কিন্তু এবার বল বোট্যানিক্যাল গার্ডেনস্ যাচ্ছ কবে ?"

"কেন, পরশু না বল্লে সেখানে গাছপালার সার দেখতে আর কি যাবে, তোমাদের দেখছি বাপু মিনিটে মিনিটে মত বদলায় ।"

ছেলেমানুষী করিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া অপর্ণা বলিল, "তা' হয় বেশ হয় আমি যাবো তো একশ বার, এখন নিয়ে যাচ্ছ কবে বল ।"

স্ত্রীর গলা টিপিয়া সস্নেহে যতীশ বলিল "বাপরে কী প্রতাপ —তোমার খুসী হয় কালও আমি শেষের দুই ঘণ্টা ছুটি দিয়ে আস্‌তে পারি ।"

"তাই এসো,—আস্‌বে ?" "আসব"

"ঠিক ?" "ঠিক ।"

"এবার তোমার জন্য লুকিয়ে চারটী ভাত নিয়ে আসতে পারি কি না দেখি ! কত কীর্ত্তিই যে হলো, কিছু না খেয়েই তো বেলা দুটা পর্য্যন্ত আছ ।"

"সেটা মশাইর দৌলতে । যাক ভাত থাকলে নিয়ে এসো আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই ।"

অপর্ণা শুভ্র সুন্দর বাহু দুখানি লীলাইত করিয়া বিস্রস্ত চুলগুলি কুণ্ডলী করিয়া বাঁধিয়া খাবারের সন্ধানে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ।

সমাপ্ত ।